প্রেম, বিশ্বাস ও নির্ভরতা

জুলফিয়া ইসলাম

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

'ভালোবাসা' এমন একটি অদ্ভুত সম্পর্ক, যা কখনও ভালোবাসা, কখনও উপেক্ষা, কখনও বা প্রবল বিরাগ– যা শত আঘাতেও অবিচল। ভালোবাসা দুঃখকে মেনে নেয়ার মানসিক প্রস্তুতি, রিক্ততার মাঝেই পূর্ণতার অনুভূতি। যে অনুভূতি মনকে ধরে রাখে কেন্দ্রবিন্দুতে। উদার দৃষ্টিভঙ্গি কখনও উৎকণ্ঠিত হয় না, হারিয়ে ফেলে না নিজকে। সুখে-দুঃখে, শান্তিতে-অশান্তিতে মন তার একাগ্রতা হারায় না। নিজের ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলে ভালোবাসা। জগতের সকল বিচার, অবিচার, সৎ, অসৎ, শিল্প ও দক্ষতাকে আয়ত্বে নিয়ে আনে ভালোবাসা। পথ আর বাঁধা এ দুটো মিলেই জীবন। জীবনের চালে ভুল হলেই হার। এ জন্য চাই মনের মুক্তি। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য নিঃসঙ্গ মনকে কি ক্ষুদ্র থেকে বিশালের দিকে ঠেলে দিতে পেরেছি আমরা ? পৃথিবীর জটিল আবর্ত থেকে পথ চিনে লক্ষ্যে পৌছাতে হলে মনকে স্থির করে জীবনকে ভালোবাসতে হবে। প্রেম, বিশ্বাস ও নির্ভরতার মাঝেই লুকিয়ে আছে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা।

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০২
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
কম্পোজ
ওয়াটার ফ্লাওয়ার
২৮/এ কাকরাইল রুম ১২ ঢাকা
দাম
আশি টাকা

সুচি

প্রেম, বিশ্বাস ও নির্ভরতা - ১১
গভীর নির্ভরশীল ভালোবাসাই প্রেমের শাশ্বত রূপ - ১৫
যৌবনের দাবী - ১৯
সভ্যতার অগ্রগতিতে প্রেমের জয়গান - ২১
প্রেম ও বন্ধুত্ব - ২৩
নিষিদ্ধ সমাজ ও অনুমোদিত প্রেম - ২৫
দাম্পত্য জীবন একটা শিল্প - ২৮
স্বামী স্ত্রীর উন্নত মানসিক পরিণতি - ৩১
প্রেমহীন দাম্পত্য জীবন - ৩৩
দাম্পত্য ভালোবাসা - ৩৫
পারিবারিক মিলন মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে - ৩৭
সন্তানের ভালোবাসা - ৪১
কৈশোরের ভালোবাসা - ৪৬
আশা ভালোবাসা - ৪৯
ভালোবাসার নারী- ৫২
বুড়ো মানুষ প্রাজ্ঞ মানুষ - ৫৯
বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে পারিবারিক ভালোবাসা - ৬৫
বৃদ্ধের জীবন যাপনের প্রস্তুতি - ৬৭
চেনা ভূবনে অচেনা মন - ৬৯
মুখোশের আড়ালে নিজকে চেনা - ৭৪
গাম্ভীর্যের অপর নামই কি ব্যক্তিত্ব? - ৭৮
অধিকতর সম্পূর্ণ ও বাস্তব জীবনই সত্য - ৮১
নির্দয় ও নির্মমতাই বাস্তবতা নয় - ৮৩
সমস্যা যত সমাধান তত - ৮৫
ব্যর্থতা ও সফলতা - ৮৭
সৃজনশীলতা, সৌন্দর্য, রুচি ও নতুনত্ব - ৯১
পারস্পরিক সম্পর্ক - ৯৪
সম্পর্কের উন্নয়নে - ৯৯
মনের আয়নায় নিজকে দেখুন - ১০১
পরিবর্তন জীবনকে অধিকতর সুন্দর করে - ১০৭
সততা, সত্যবাদিতা, ভালোবাসা - ১১২
সত্য এক তিক্ত বটিকা - ১১৪
চেতনার রঙে পান্না হয় সবুজ চুনি হয় রাঙা - ১১৭
ধন্য এ মোর ধরণী - ১১৯
স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন - ১২২

ভূমিকা

জীবন তো এক আলোছায়ার খেলা। যেখানে অতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে একজন বুদ্ধিমান মানুষও বিচিত্র এক অনুভবের জগতে বাস করে। চীরচেনা অভ্যস্থ জীবন আর সম্পর্কের মাঝে সে তো বিবর্ন। স্বপ্নের মাঝেই তো তার জাগরণ। মানুষ কি তার জীবনের বহিরঙ্গ চাপের মাঝেও অন্তর্মুখী মনটাকে একবার দেখার চেষ্টা করে? যে জীবনে সে অনুভব করতে পারে নিজেকে? কিছু কিছু সময় বাস্তবের পুরস্কারও ম্লান হয় অন্য কোন চরিতার্থতার কাছে। কোন সে চরিতার্থতা? সে কি মানুষের প্রতি মানুষের বিচিত্র বন্ধন? কোনটি বড়? আবেগ? ভালোবাসা? নাকি কর্তব্য বোধ? মানব বন্ধনের সত্যতার বিন্দু কোথায়? সত্য। সে তো বাস্তবে এক আর স্বপ্নে আরেক। "ভালোবাসি" আর "ভালোবাসি না"। এই দুইয়ের মাঝে তফাৎ ছোট একটু "না" এর। শেষ অবধি বেঁচে থাকাটাই সত্য। যেখানে কান্না হাসির দোল আর পৌষ ফাগুনের খেলা।

প্রেম, বিশ্বাস ও নির্ভরতা

"কোন পরিখাই খুব প্রশস্ত নয় এবং কোন দেয়ালই খুব উঁচু নয়, ভালোবাসা যদি থাকে, দুজনে এসে মিলবেই। কোন ঝড়ই খুব ভয়ঙ্কর নয় এবং কোন রাত্রিই খুব অন্ধকার নয়, ভালোবাসা যদি থাকে দুজনে পরস্পরকে দেখবেই। যেমনভাবেই হোক জ্যোৎস্না আসবেই, আবার আলো ঝরবে, যেমন ভাবেই হোক মোমবাতি, আলো বা একটি লণ্ঠন জ্বলবেই"।

— সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (লোটাকম্বল)

প্রেম, প্রীতি ভালোবাসা যুগ যুগ ধরেই রহস্যময়তা এবং এক দুর্বোধ্য জটিলতা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রেম মানুষের জীবনকে বিভিন্নভাবে স্পর্শ করে, প্রেম জাত-ধর্ম মানে না, প্রেম সার্বজনীন। কখনও প্রেম আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কখনও বা প্রেম সর্বগ্রাসী। এভাবে ব্যক্তিবিশেষে প্রেমের বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। প্রেমের এ রাজ্যে কেউ বলে "ভালোবাসা পেয়েছি" আর কেউ বলে "ভালোবাসা দিয়েছি" অর্থাৎ কেউ বলে "ভালোবাসি"। কেউ বলে "ভালোবাসো," এ একটা দেয়া-নেয়ার ব্যাপার। ভালোবাসার কোন বস্তুগত রূপ নেই। এটা একটা অনুভবের ব্যাপার। আর এ কারণেই ভালোবাসার রাজ্যে ভুল বুঝাবুঝি ঘটে থাকে। ভালোবাসা প্রকাশিত হতে পারে আচার আচরণের মধ্য দিয়ে। ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে হলে উভয় প্রান্ত থেকেই দেয়া-নেয়ার প্রবাহ থাকা চাই। ভালোবাসার কোন প্রান্তে হয়তো দেয়া-নেয়ার প্রবাহ বেশী থাকে আবার কোন প্রান্তে হয়তো বা কম। ভালোবাসার ক্ষেত্রে যে কোন মাধ্যম থাকা চাই। ভালোবাসা প্রবাহের একপ্রান্তে কেবলই দেয়া এবং অপর প্রান্তে কেবল নেয়া মা ও সন্তানের ভালোবাসায় পরিলক্ষিত হয়। মা সন্তানকে দিয়েই আনন্দ পান। কিন্তু এই মা ও শিশু সন্তানের ভালোবাসাও অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক কারণে ব্যহত হয়ে থাকে। যেমন অবৈধ শিশুর জন্ম মায়ের উপর এমন সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে যে সেখানে ভালোবাসা ব্যহত হয়। তাই আমরা দেখতে পাই যে শিশুর বাবার পরিচয় দেয়া যাবে না এমন অনেক ক্ষেত্রে মা তাকে জন্মের সময়েই ত্যাগ করে

চলে যান। আবার যেসব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সামাজিক বিকাশ নেই তাদের আবার এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মা ও শিশু সন্তানের ভালোবাসা উষ্ণতায় আবৃত। ভালোবাসার এই রূপ প্রকৃতিপ্রদত্ত। প্রকৃতি ভালোবাসাকে মানুষ ও উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের বুদ্ধি বৃত্তির উপর ছেড়ে দিয়ে তাদের স্বভাবের মধ্যে গ্রথিত করে দিয়েছেন। এটি ভালোবাসার একটি আদর্শ অবস্থা। কিন্তু বাস্তবে এরূপ অনাবিল, অবিমিশ্র ও শর্তহীন ভালোবাসা দুর্লভ। মানুষের মনের মূল উপাদান দুটি সহজ বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। একটি হলো হিংসাত্মক বৃত্তি অপরটি হলো প্রেমাত্মক বা কামাত্মক বৃত্তি। প্রথমটি ক্রোধ, হিংসা, বিচ্ছেদ, ধ্বংস ও মৃত্যুর বাহক। দ্বিতীয়টি প্রেম, প্রীতি ভালোবাসা, দয়া বন্ধুত্ব ইত্যাদির বাহক। এ দুটো বৃত্তিই আমাদের মাঝে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। এই বৃত্তিগুলো আছে বলেই মানুষের মানসিক শক্তির প্রকাশ ঘটে। এই দু' প্রকারের বৃত্তির কোন একটির প্রকাশ অপরটিকে নিস্প্রভ করে তোলে। আবার অনেক সময় একটি বৃত্তি অপর বৃত্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ভালোবাসা ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ক্রোধ ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়।

মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যুদ্ধ, বিগ্রহ, অশান্তি ও ধ্বংস। এই ধ্বংস যজ্ঞ যখন শেষ হয় তখন মানুষ নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। পরমুহূর্তে প্রেম বৃত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য উঠে পড়ে লাগে।

সভ্যতার ইতিহাসের যাত্রাপথের শুরু কিন্তু এভাবেই। মানব সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন সাহিত্য ও সংস্কৃতি এ সব কিছুরই উদ্দেশ্য হলো মানুষের ধ্বংস বৃত্তিকে প্রেমের বৃত্তিতে রূপান্তরিত করা।

ধ্বংস বৃত্তি যখন বাইরের দিকে ধাবিত হয় তখন মানুষ অপরের প্রতি ক্রোধ, হিংসা ও ঈর্ষা বোধ করে থাকে। এই বৃত্তি যখন নিজের দিকে ধাবিত হয় তখন মানুষ আত্মহনন বা আত্মবিনাশের পথ বেছে নেয়। মানুষের কামবৃত্তির বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গি হলো মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন এবং মানুষের সাথে একান্ত অনুভবের মাঝে। এর অভ্যন্তরীন প্রকাশভঙ্গি হলো আত্মপ্রেম বা আত্মকেন্দ্রিকতা। একটি মানবশিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার নিজের সুখ ও আরামের ব্যাঘাত ঘটলেই সে ক্রোধান্বিত হয়। মায়ের প্রতি ভালোবাসার দাবী যখন প্রত্যাখ্যাত হয় তখন তার মনে ঈর্ষার জন্ম নেয়। প্রেমপ্রার্থী যদি তার প্রেমাস্পদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয় তখন সেই বঞ্চনার ফল হিংসায় রূপান্তরিত হয়। প্রেমিক তার প্রেমিকার কাছে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে এসিড নিক্ষেপের ঘটনাও বিরল নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ লিপ্সাও প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে।

শৈশবে মা বাবার ভালোবাসার মধ্য দিয়ে একজন মানবশিশু তার যাত্রাপথের পাথেয় সঞ্চয় করে নেয়। মাতৃপ্রেম ও মাতৃস্নেহের নিরাপদ আশ্রয়ে শিশুর সুখানুভূতি

ঘটে থাকে নিজের শরীর ঘিরে। শিশুর আত্মকেন্দ্রিক অবস্থায় প্রথম তার জীবনে যার আবির্ভাব ঘটে থাকে সে হচ্ছে তার মা। তাই প্রায় প্রতিটি শিশুই তার মায়ের প্রতি আসক্ত থাকে। ধীরে ধীরে তার ভালোবাসার জগৎ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। মা, বাবা, ভাই, বোন, প্রতিবেশী, বন্ধু প্রভৃতি পর্যায়ে ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রী সন্তান। শেষে কাজকর্মের জীবনে। সমাজ ও দেশ বিদেশে। সর্বোপরি সমগ্র বিশ্বের মানুষের প্রতি ভালোবাসার জগত বৃদ্ধি পায়।

ব্যক্তি জীবনের চরিতার্থতা ঘটে এভাবেই। তাই ব্যক্তি যদি ক্ষুদ্র অবস্থায় আত্মকেন্দ্রিকতার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে বৃহতের সাথে মিলিত হতে না পারে। তবে সেই ক্ষুদ্র মানুষটির ভেতর প্রেমবৃত্তি জাগ্রত না হয়ে ধ্বংসবৃত্তি জাগ্রত হতে পারে। শিশু মা-বাবার ভালোবাসার মাঝে যেমন ভালোবাসার পাঠ গ্রহণ করে থাকে। তেমনি মা বাবার ভালোবাসার বঞ্চনায় ক্রোধ ও হিংসাও তার মাঝে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা-সংস্কৃতির এই সৃজনাত্মক বা মিলনাত্মক কাজের সূচনা আমরা দেখতে পাই পারিবারিক সম্পর্কের মাঝে। মা, বাবা সন্তানের জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেন। বন্ধু বন্ধুর জন্য, প্রনয়ী প্রিয়ার এবং প্রণয়িনী প্রিয়র জন্য আত্মত্যাগ করে। বীর দেশের জন্য। বৈজ্ঞানিক সত্য উদঘাটনের জন্য নিজেকে নিমগ্ন রাখেন। এ সবই মানুষের প্রেমবৃত্তির নানা উদাহরণ।

তাইতো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে"।
কিংবা তোমার প্রেমের বীর্যে/ তোমার প্রবল প্রাণ সখীরে করিলে দান।"

শ্যামা

এখানে প্রেমের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটছে। মানুষ ভালোবাসে এবং ভালোবাসা পাবার জন্যই বাঁচতে চায়। ভালোবাসা বেঁচে থাকার তাগিদ অনুভব করতে শেখায়। মানুষের মাঝে যদি ভালোবাসা কিংবা নির্ভরতা না থাকত তবে মানুষ বাঁচতে পারত না। ব্যক্তিজীবনে মানুষ মা-বাবা, সন্তান-সন্ততিও প্রেমিকা কিংবা স্ত্রীর ভালোবাসা লাভের জন্য অনেক কুকর্মও করে থাকে। কিন্তু এ ধরনের কাজ কর্ম যদিও কারোই কাম্য হওয়া উচিত নয়। তারপরও মানুষ সংসারে স্ত্রী-পুত্রের মমতায় বেঁচে থাকে। কারণ নিঃসঙ্গতায় জীবন চলতে পারে না।

সংকীর্ণ চিন্তার মানুষ শুধুমাত্র নিজেকে ভালোবাসে এবং নিজের জন্য বাঁচে। সামাজিকতা মেনে চলে যে মানুষ সে মানুষ স্বাভাবিক মানুষ। আবার যারা বৃহত্তর স্বার্থে বাঁচে তাদেরকে আমরা মহৎ মানুষ হিসাবেই জানি।

কিছু মানুষ আছে যারা সারাক্ষণ ভাবে অপর আমাকে ভালোবাসুক, কিন্তু ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসা দিতে হবে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভালোবাসায় হয়তো সাময়িক আনন্দ লাভ সম্ভব, কিন্তু ভালোবাসা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার আনন্দ ব্যক্তি ভালোবাসার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে আনন্দ দান করে।

মানুষ মানুষকে ভালোবাসে এবং এই ভালোবাসা বিশ্বাস ও নির্ভরতার মাঝেই বেঁচে থাকে। মানুষের সাথে মানুষ বাঁচার তাগিদে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলে। এভাবে বিভিন্ন নিয়ম নীতি ও আচার আচরণ মানুষের মাঝে গড়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে মানুষ গড়ে তুলেছে পারিবারিক জীবন। পরবর্তীতে তা সামাজিক জীবনে রূপলাভ করেছে আমরা জীবনকে ভালোবাসি। আমরা কারো জন্যে বা কোন কিছুর জন্য বেঁচে থাকতে চাই। আমরা আমাদের চারিপাশের কিছু পরিচিত মুখকে ভালোবাসি। ভালোবাসি প্রকৃতিকে। আবার এই পরিবেষ্টনীর মাঝেই আমরা আমাদের জীবনস্পৃহাকে বাঁচিয়ে রাখি। আমাদের বাঁচার জন্য অনুকূল পরিবেশ চাই। চাই জীবনের মূল্য। পরিবেশ যদি প্রতিকূল হয় তবে পারস্পরিক ভালোবাসা নষ্ট হয়। জীবনের দাবি মেটাতে চাইলে ভালোবাসার প্রয়োজন রয়েছে।

ভালোবাসার ক্ষেত্রে নিজেকে বড় করে দেখলে জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তাকে ঠকতে হয়। ভালোবাসার স্ফুলিঙ্গে বুকের প্রদীপ জ্বলে ওঠে। মানব সংসার ভালোবাসায় নিমজ্জিত।

গভীর নির্ভরশীল ভালোবাসাই প্রেমের শাশ্বত রূপ

"যে প্রেম অনুরাগের পাত্রটিকে বিকাশের জন্য ছেড়ে দেয়, সে প্রেমই যথার্থ প্রেম। যে প্রেম ধরে রাখে, বিকাশের দিকে তাকায় না, সে প্রেম প্রেম নয়, স্বার্থপরতা"

— বার্ট্রাণ্ড রাসেল (সুখ)

কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসতে গিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। ভালোবাসার মানুষকে আঁকড়ে ধরা প্রেমের একটি দিক। অপরদিকে ভালোবাসার মানুষটিকে বিকাশের জন্য সহযোগিতা করা আরেকটি দিক। প্রেমাস্পদকে যে রক্ষার জন্য আঁকড়ে ধরে তার ভালো দিকটি হচ্ছে ভালোবাসার মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখা। আবার যে বিকাশের জন্য ছেড়ে দেয় সেই ভালোবাসার মূল্যই বেশী। কারণ নিজেকে বিকশিত করতে গেলে বাঁচতেই হবে। কিন্তু বেঁচে থাকলেই যে নিজেকে বিকশিত করা যাবে তা কিন্তু নয়। প্রেম এমন হওয়া চাই যেন প্রেমাস্পদের মনে ভীতির সৃষ্টি না হয়। কারণ যে প্রেম শুধুই অধিকার খাটাতে চায়, যে ভালোবাসা ভালোবাসার মানুষের সদগুণগুলির বিকাশ ঘটায় না, যে ভালোবাসা হারিয়ে যাবার ভয়ে সর্বদা বিপদের আশঙ্কা করে, সে ভালোবাসার মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতিই হয়। যে ভালোবাসার কারাগার মানুষকে শক্তিহীন ও পঙ্গু করে ফেলে। সে ভালোবাসা কল্যাণ আনতে সক্ষম নয়। যে প্রেম প্রেমাস্পদের কাছে সর্বদা আশ্রয় খোঁজে সে প্রেম ভীরু প্রেম। অতিমাত্রায় আবেগ প্রেমের ধ্বংস ডেকে আনে। অতি আবেগ থেকে প্রেমের ক্ষেত্রে অধিকারবৃত্তির জন্ম নেয়। যে অধিকারবৃত্তি মানুষকে বিকাশের সুযোগ দেয় না। শুধুমাত্র কর্তৃত্ব পরায়ণতায় আবদ্ধ করে রাখে। সে প্রেম কল্যাণ বয়ে আনে না।

সন্তানের প্রতি অত্যধিক স্নেহ যেমন সন্তানকে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে। তেমনি প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমাস্পদের প্রতি অতিরিক্ত অধিকারবৃত্তি একপক্ষকে কতৃত্বপরায়ণ করে তোলে। এবং অপরপক্ষকে ভীরু করে তোলে। ফলে বিয়ের পরে এক পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেমিক-প্রেমিকার পরিবর্তে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক এসে পড়ে। আর পুরুষরাও ভীরু রমণীদেরকে পছন্দ করে থাকে। সতিকার

প্রেম প্রেমাস্পদকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে না। উগ্র মেজাজ এবং অতিরিক্ত আবেগ ভালোবাসার শত্রু। এতে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ভালোবাসা নষ্ট হয়ে পড়ে। এ দুটো জিনিস ভালোবাসাকে ধ্বংস করে ফেলে। যে ভালোবাসায় স্বার্থ জড়িয়ে থাকে যে ভালোবাসা সর্বক্ষণই ভালোবাসার মানুষটিকে কাছে পেতে চায়। নিজের বিপন্নতার জন্য সর্বক্ষণ অন্যের নির্ভরতা খোঁজে। সে ভালোবাসা করুণা পেতে চায়। যে ভালোবাসায় স্বার্থ কম থাকে। ভালোবাসার মানুষটির সান্নিধ্যে নিজেকে যে নিরাপদ বোধ করে। যে মানুষ নিঃসংকোচে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব মেনে নিতে পারে তাই সত্যিকার ভালোবাসা। যে ভালোবাসা সব সময় ভালোবাসার মানুষটিকে রক্ষা করতে চায়, সে ভালোবাসার চাইতে যে ভালোবাসা মানুষটিকে সারাক্ষণ রক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত না থেকে প্রকাশিত হবার সুযোগ দেয় সে ভালোবাসাই উত্তম। যে ভালোবাসা প্রেমাস্পদকে আশ্রয় দিয়ে তার জীবনের দুঃখের অবসান ঘটায় তা মন্দের ভালো। কিন্তু শুধুমাত্র প্রেমাস্পদের দুঃখ দূর করাই নয়। মানুষ যাতে নিজেকে চিনতে পারে। নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে সেটুকু বিকাশের সুযোগ করে দেয়াটাই উত্তম ভালোবাসা।

ভালোবাসা যদি ভালোবাসার মানুষটিকে পরিপূর্ণ ভাবে পেতে চায়। তবে একের পর এক দাবী বাড়তেই থাকে। একসময় সে দাবীর পরিপূর্ণতা এসে গেলে দেখা যায় ভালোবাসার পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। এ ধরনের ভালোবাসা শুধু নিতেই জানে কিছু দিতে জানে না; এ ভালোবাসার পেছনে উদ্দেশ্য লুকায়িত থাকে। উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে গেলে ভালোবাসার মানুষটিকে ভুলে যায়। মানুষটির কি ক্ষতি হলো না হলো তা আর ভেবে দেখে না।

রাসেলের সাথে সুর মিলিয়ে বলা যায়, "আমাদের ভুল এখানে যে, আমরা নিজেকে মুক্ত করার চেয়ে অপরকে বাঁধতে ভালোবাসি।" রমাপদ চৌধুরীর 'বাহিরি' একটি সম্পর্কের দর্পণে আমরা দেখতে পাই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের ভেতরের প্রতিচ্ছবি। দয়াময়ীর মাতৃসুলভ মমতায় বংশী নামের অন্ধ ভিখারীর ছেলেটি আশ্রয় পেলো সুধাময় বাবুদের সংসারের মায়াজালে। দেখতে দেখতে নিজেকে চেনবার সময় এলো তার। যে ছেলেটিকে পথ থেকে কুড়িয়ে আনা হলো। সেই ধীরে ধীরে বংশী থেকে বংশীধর অধিকারী। শেষ পর্যন্ত মি: বিডি অধিকারী।

কিন্তু বংশীর এই উপরে ওঠাকে কি সুধাময় বাবুদের সংসারের সদস্য এবং সদস্যাবৃন্দরা মেনে নিতে পেরেছিলেন? এমন কি যে সুধাময় বাবু জানেন 'ডেভিড হেয়ারের গল্পের পেছনে ছুটে তো সব ভদ্রলোক হয়েছিস' সেই সুধাময় বাবুকে যদি বংশী 'বাবু' না ডেকে 'মেসমশাই' সম্বোধন করে তখন তিনি চমকে ওঠেন। দয়াদাক্ষিণ্য আমাদের ভদ্রয়ানার সৌখিন তবক। যখনই নীচুতলার মানুষগুলো সমানাধিকার চায় তখনই আমাদের পিলে চমকে ওঠে। একদা স্নেহময়ী দয়াময়ীর

পরিবারে যদি মি: বি ডি অধিকারী এসে পড়েন। তখন পরিবারের সকল সদস্য সঙ্কুচিত হয়ে যান। বি ডি অধিকারী সঞ্জয়ের অফিসে যান না চাকরী করতে। অর্থাৎ পূর্বের বংশী অর্থাৎ বর্তমানের বি ডি অধিকারীও তার অবাঞ্ছিত স্মৃতির মুখোমুখি হতে চান না। নেয়া যেমন সহজ নয়— দেয়াও তেমনি কঠিন। দেয়া নেয়ার কথা মুহূর্তের আবেগে বলা চলে। কেননা দেবার ঝক্কি অনেক বেশী। যাকে দেয়া হচ্ছে সে যে চিরকাল আমাদের দানের অহমিকা তোষণ করে যাবে তা কিন্তু নয়। অথচ মানুষের এ স্বভাবও দুর্মর। মমতায় হোক আর ভালোবাসায় হোক আমরা অপরকে বেঁধে ফেলতে চাই।

যে ভালোবাসার পেছনে কোন উদ্দেশ্য নেই। সহজ সম্পর্কের ভিত্তিতে যে ভালোবাসার সৃষ্টি তাই প্রকৃত ভালোবাসা। আর এ ভালোবাসা কখনও হারিয়ে যায় না। এ ভালোবাসার মূল্য অনেক। ভালোবাসা নেয়ার চাইতে ভালোবাসা দিতে পারাটা অনেক উত্তম। আর ভালোবাসা দিলে একসময় তা পাওয়া যাবেই। "ভালোবাসি" কথাটি মুখে উচ্চারণ করা অনেক সহজ। কিন্তু "ভালোবাসি" বললেই ভালোবাসা হয় না। শুধুমাত্র দৈহিক সুখের নামই ভালোবাসা নয়। ভালোবাসার মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। তাকে বিকাশের সুযোগ দেয়া। তার প্রতি কর্তৃত্ব না করে ভালোবেসে কাছে টেনে নেয়াটাই উত্তম। যে ভালোবাসা প্রেমাস্পদকে জীবন বিকাশের সুযোগ না দিয়ে তার উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়। তা ভালোবাসা নয়। "তুমি বড় হয়ে গেলে আমাকে ভুলে যাবে।" এটুকু মনে স্থান না দিয়ে, "তুমি বড় হও, আমি সর্বদা তোমার পাশে আছি।" এটাই সত্যিকার ভালোবাসা। যে মানুষ দিতে জানে সে কখনও অপরিপূর্ণ হয় না। যে দিতে জানে না শুধু নিতেই জানে সেই অপরিপূর্ণ মানুষ।

যে মানুষের প্রশংসা করতে জানে না সে ঈর্ষান্বিত মানুষ। ঈর্ষান্বিত মানুষ ভারসাম্যহীন। এসব মানুষের দ্বারা কখনও কারো উপকার হয় না। এরা সহজ সুন্দর জীবন মেনে নিতে পারে না। এই ঈর্ষাই অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করে। অথচ যার অন্তর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ সে প্রচুর ভালোবাসা দান করেও ভাবে কিছুই দিতে পারিনি। আরো ভালোবাসা দেয়া উচিত। আর অপরিপূর্ণ মানুষ ভাবে, "কোনই ভালোবাসা পেলাম না। আরো পাওয়া উচিত।" অবদমিত ভালোবাসা মানুষের মনকে কলুষিত করে দেয়। মানুষের প্রতি সহানুভূতি নষ্ট করে আক্রোশের সৃষ্টি করে।

ঈর্ষা, দেষ, ক্রোধ, ভয়— এইসব তো জীবনের ধর্ম। কিন্তু অন্য জীবের যা নাই এবং মানুষের যা আছে— সেই দুর্লভ রত্নের নাম চৈতন্য। আমাদের চৈতন্যকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। তার জন্য প্রেম চাই।— কণিষ্ক।

প্রেমে যখন রোমান্টিকতার মদিরতার পরিবর্তে বাসনারক্তিম ইন্দ্রিয়ের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে প্রেমের সুন্দরতম রূপের পরিবর্তন ঘটে। ক্রমশ প্রেম পরিণত হয় অপ্রেমে। সেটা কি আদৌ অপ্রেম নাকি প্রেমের অন্য কোন রূপ তাতে সন্দেহ থেকে যায়। তবে সত্যিকার অর্থে প্রেমের সুখ কর্মে। অন্যের জন্য কাজ করার ইচ্ছাই ভালোবাসার সত্যিকারের প্রমাণ।

ভালোবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালোবাসা পরোপকারী, তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা, ভালোবাসা কখনও বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ, ভালোবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে, তার বিশ্বাস সীমাহীন। সীমাহীন তার আশা ও ধৈর্য্য।—
মিশেল কোয়াস্ত।

যে প্রেম দৈহিক সুখের প্রতি বেশী মাত্রায় ঝুঁকে পড়ে। সে প্রেম আবেগ তাড়িত। সময়ের সাথে সাথে ভালোবাসা মান অভিমানে পর্যবেসিত হয়। প্রথমে ক্ষোভ, পরে তা বিতৃষ্ণার তিক্ততায় পৌছে যায়।

যৌবনের দাবী

প্রেমের নাম বাসনা। সে বাসনায় দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়া দুটোই কাজ করে। এই বাসনা যখন কমে আসে। বাস্তব জীবনের রূঢ় সত্যগুলো যখন একে একে ফুটে ওঠে তখন প্রেমের প্রকাশভঙ্গি কি কমে যায়? গাছের সবুজ পাতা একসময় হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে। দিনের শেষে সূর্যাস্ত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের এই নিয়ম চিরন্তন। শরৎশেষে হেমন্ত আসে এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তেমনি রসসিক্ত প্রেমও সময়ের ব্যবধানে নিরস হয়ে পড়ে। বাসনার ঘটে অবসান। যে প্রেম সকল বাসনার উর্ধ্বে সে প্রেমকে আমরা চিরস্থায়ী ভেবে নেই। কিন্তু বাসনামুক্ত প্রেম কি সম্ভব? অন্তত নারী পুরুষের জৈব বাসনা বৈশিষ্ট্যের কারণে?

প্রেমের মৃত্যু ঘটে প্রধানত দুটো কারণে। প্রেম যখন ক্লান্তিকর কিংবা একঘেয়েমীতে পর্যবেষিত হয় কিংবা বৈচিত্র সন্ধানী মন যখন চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। তখনই প্রেমের বিদায় বা প্রস্থানের খেলা।

প্রেম মানুষের জীবনে বাঁচার তাগিদ বাড়ায়। প্রেম জীবনে সুখ নিয়ে আসে। জীবনে প্রেম না থাকলে মানুষের জীবনের অন্যান্য দিকগুলোও অপরিপূর্ণতায় ভরে থাকে। প্রেমের উদ্দেশ্য হলো উপভোগের মাধ্যমে নিজেকে পরিতৃপ্ত করে তোলা। তাই প্রতিটি মানুষই কম-বেশী প্রেমিক মনের অধিকারী। প্রেমে পড়া প্রতিটি মানুষেরই জীবনের স্বাদগুলো বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে যায়। প্রেমের সংস্পর্শে মানুষ রঙিন ফানুস ওড়াতে থাকে। প্রেমিক-প্রেমিকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অন্যরকম ভালোলাগার দৃষ্টিতে উপভোগ করে থাকে।

যারা প্রেমের মধুর পরশ থেকে বঞ্চিত তারাই কেবল প্রেমের নিন্দা করে বেড়ায়। কিন্তু বাস্তবতা বিবর্জিত যে প্রেম সে প্রেম হচ্ছে অন্ধ প্রেম। সমালোচনাহীন প্রেম সকলেই কামনা করে। প্রতিটি প্রেমিক-প্রেমিকাই চায় তারা উভয়ে উভয়ের ত্রুটি না খুঁজে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোক। কিন্তু যে প্রেম অপক্ষপাত, যে প্রেম সঠিক সমালোচনা সইতে পারে বোঝা যায় সে সবল হৃদয়ের অধিকারী। কিশোর বয়সের প্রেমকে মনে হয় একান্ত হৃদয়ের। কিন্তু সেই প্রেম যখন দৈহিক অভিজ্ঞতা লাভ করে তখন সে হৃদয়াবেগ বেশিক্ষণ থাকে না। তারুণ্যের প্রথম প্রেম পুরোপুরিই সুকুমার প্রাকৃত প্রেম। সেই প্রেম যদি অনিবার্য নিয়মে অতীত হয়ে যায়। তবে তা চৈতন্যে আঘাত হানে। সেই আঘাত অস্তিত্বে ওলট-পালট সৃষ্টি করে।

যে প্রেমের সাথে দেহের কোন সংযোগ নেই, সে প্রেমকে আমরা মহান ভেবে থাকি। যে দেহ স্পর্শ করা হয়ে গেছে তার চাইতে যা স্পর্শ করা হয়নি সেটাই বেশী কাঙ্খিত। প্রেম একটি মানসিক অবস্থা। যা প্রাপ্তির একটি আপাত অবস্থা। নানা প্রতিকূলতা, সামাজিক অনুশাসন কিংবা অব্যক্ততার কারণে পাওয়া হয়ে উঠে না সেই প্রেমেরই জয়গান বেশী। অর্থাৎ প্রেম যখন দেহের মঝে তৃপ্তি খুঁজে পায়। তখন তা কামে পরিণত হয়।

প্রাকৃত প্রেমে বিশ্বাসী দু'জন নরনারী যদি একত্রে কোন নির্জন স্থানে একত্রিত হয়। তখন তাদের দেহ পরস্পর কথা বলবে। যে প্রেমে কামনা মেটে না সেই প্রেমই হচ্ছে ব্যর্থ প্রেম। যৌনতৃষ্ণা মানবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দ্বিতীয় প্রধান সহজাত বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃত। মানুষের দেহমনে যে যৌনতৃষ্ণা তা প্রকৃতিরই দান। মানুষের এ তৃষ্ণা রক্তমাংশের গভীরে অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। এ আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতাই মানব জীবনের সার্থকতা।

দাম্পত্য জীবনেও অনেকক্ষেত্রে প্রেমের এ আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্তিদায়ক করে তুলতে পারে না। সংশয় আর অবিশ্বাস প্রেমবোধকে সরিয়ে দেয়। দাম্পত্যজীবনের বাস্তবতায় ঘরোয়া প্রেম আপন চৌহদ্দিতে অপ্রেমের প্রকাশেই সত্য। দাম্পত্যজীবনে প্রেমের চেয়ে গাঁটছড়ার বন্ধনটাই সত্য।

রোমান্টিক প্রেম রহস্য ছাড়া হয় না। যে প্রেম খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখে সেখানেই নেশার উন্মত্ততা থাকে। নতুবা প্রেম ক্লান্তিকর একঘেয়েমীতে রূপান্তরিত হয়। পরিপূর্ণভাবে পাওয়া হয়ে গেলে তা আবেগ হারিয়ে ফেলে। প্রেমে কিছুটা না পাওয়া থাকলেই সেখানে চাওয়াটা আসবে। ভালোবাসা যখন ভোগ না করতে পারে তখন তা প্রেমে পরিণত হয়। এজন্য ভালোবাসতে হলে ভালোবাসার পাত্রের কাছে বেশী প্রত্যাশা না করাই ভালো। বেশী আশা করলে তা যদি না পাওয়া যায় তবেই মনের মাঝে অভিযোগ বাসা বাঁধে। বেশী চাইতে গেলে না পেলে দুঃখ পেতে হয়। সুতরাং কম চাওয়াটাই উত্তম। কম চাওয়ার পর যা পাওয়া যায় তাই উপরি পাওয়া। কাম জীবনকে উন্নত করে না। কাম মানুষকে লোভী করে তোলে এই লোভের বাসনা মানুষকে স্থিতিশীল করে না। কামনার তীব্র পিপাসা মানুষকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়। যে প্রেমে যৌবনের দাবী নেই সে প্রেম মানুষকে সংযমী ও মহৎ করে তোলে। মানুষ শুধুমাত্র যৌনক্রিয়া দ্বারা তার প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি লাভে সক্ষম। যে যৌনক্রিয়ার মধ্যে পূর্বরাগ, ভালোবাসা এবং ঘনিষ্ঠ সাহচর্য থাকে না সেখানে ক্ষণিকের দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যায়। কিন্তু মানসিক ক্ষুধা অপূর্ণই থেকে যায়। এতে করে সার্বিক তৃপ্তি লাভ সম্ভব নয়। স্থূল ও বর্বর স্বাধীনতা মানুষকে সুখ দেয় না।

সভ্যতার অগ্রগতিতে প্রেমের জয়গান

আমাদের জীবদ্দশায় খুব কমই আমরা নিজের জন্য বাঁচি। আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা অন্যের মাঝে নিজের গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে বেড়াই। সেই গ্রহণযোগ্যতা আমরা একজন নারী, পুরুষ কিংবা বৃদ্ধ বালক যে কোন কিছুর মাঝেই দেখতে চাই। কিংবা নির্ভর হতে চাই। আর এই নির্ভরতার মাঝেই আমরা বাঁচতে চাই। নির্ভরতা আমাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

মানব প্রজাতির অবিচ্ছেদ্য দুটি অংশ নারী ও পুরুষ। একই প্রকৃতির নীচে সামাজিক ভাবে সভ্য মানুষ হয়ে গড়ে উঠার উষালগ্নে নারী পুরুষের সংগ্রাম শুরু হয় একই সাথে।

নারী ও পুরুষ একের প্রতি অন্যের যে টান তা কোন অংশেই দোষের কিছু নয়। সৃষ্টির আদি থেকেই নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে আসছে। পুরুষ ছাড়া যেমন নারী বাঁচতে পারে না। তেমনি নারীর সঙ্গ ও সহযোগিতা ছাড়া পুরুষ জীবন ধারণ করতে পারে না। মানুষ মাত্রেই কামদেবীর পূজারী। নারী ও পুরুষ উভয় উভয়ের রক্ত মাংশে জড়িয়ে আছে। নারী পুরুষের জীবনে প্রেম একান্ত জরুরী। ভালোবাসা ও প্রেম এক নয়। ভালোবাসায় মিশ্রিত থাকে স্নেহ প্রীতি, শ্রদ্ধা সমীহের ভাব। যেমন— মা সন্তানের ভালোবাসা। পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা ও বন্ধু-বান্ধবের ভালোবাসা। এ ভালোবাসায় কামনা মিশ্রিত থাকে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী কিংবা যৌবনের ভালোবাসায় কামনা যুক্ত থাকে। এরই নাম প্রেম।

কিন্তু মানুষের রিপুর তাড়না যখন সত্যের চেয়ে বড় হয়ে যায়। কামের মাঝে আত্মাকে না দেখে মাংসকেই বড় করে দেখে। সেই রিপুর তাড়না উগ্র। এ এক ধরনের মোহ। সে মোহ কেটে গেলে সবই ফাঁকা হয়ে যায়। যা চৈতন্যের আলোকে ম্লান করে দিয়ে সত্যকে আবৃত করে রাখে। এ এক ধরনের আবরণ যে আবরণ মানুষের মনকে আবিষ্ট করে রাখে। নারী পুরুষের ভালোবাসায় যৌনভিত্তিক প্রেমের চেয়ে স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশী। যৌনতার উপর বেশী জোর দিলে সে প্রেমে কামনা হ্রাস পায়। আবার চোখের আড়াল হলেও প্রেমের মৃত্যু ঘটে।

ভালোবাসাকে দৃঢ় পুষ্ট ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। যে ভালোবাসায় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। সেখানে ভালোবাসা স্থায়ী নয়। এ হলো ক্ষণিকের মোহ।

যে সম্পর্কের মাঝে নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্মান নেই। যেখানে মানুষের কর্মশক্তি, মনুষ্যত্ব বিবেক, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির কোন মূল্যায়ন নেই সেখানে উভয়ে উভয়ের জীবনে বাঁধাস্বরূপ।

যে প্রেমে স্বাধীনতা নেই। যে প্রেম ব্যক্তিস্বাধীনতাকে আবদ্ধ করে ঘরে বন্দী করে রাখতে চায়। সে প্রেম কামুকতার পর্যায়ে পড়ে। যে প্রেমে আত্মার স্বাধীনতা নেই সে প্রেম জীবনকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখে। বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রেমের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি আভ্যন্তরিন সৌন্দর্য যদি স্থান না পায় তবে মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব হয়। যে রূপের আদর শুধুমাত্র ভোগের জন্য, সে আদর চিরস্থায়ী হয় না।

নারী-পুরুষ একের প্রতি অন্যের ভালোবাসা শুধুমাত্র ভোগের মাঝেই যেন শেষ না হয়। কারণ বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের জীবনে যত রকমের ঈর্ষা এবং ক্রোধ তার পিছনে রয়েছে ভালোবাসা না পাওয়ার যন্ত্রণা। মানুষের মনে হিংসা ও প্রেম দুটোই পাশাপাশি কাজ করে থাকে। হিংসা ও ক্রোধ মানুষের জীবনে বিপর্যয় ও ধ্বংস ডেকে আনে। প্রেমে আনে মিলন ও সৃষ্টি। সভ্যতার অগ্রগতিতে আমরা প্রেমেরই জয়গান গাই।

প্রেম ও বন্ধুত্ব

টলস্টয়ের জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা তিনি নিজেই করেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কীর্তি বা যে কারণেই হোক না কেন, মানুষের স্বাধীন সত্তা যতই সামাজিকভাবে বড় জীবনকে আঁকড়ে ধরে ততই তার জীবন অনিবার্য ইতিহাসের নিয়মের বশীভূত হয়। সামাজিক জীবন এবং মুক্ত ইচ্ছাময় জীবন। এই দুই জীবনের সম্ভাব্যতা বাস্তবে কতটুকু?

বিবাহসূত্রে যে বন্ধন সত্য। পরনারী সে বন্ধনে আবদ্ধ নয় বলেই প্রার্থনীয়া। সে নারী অতি সাধনার ধন। প্রেমের পরিণাম সর্বক্ষেত্রে সুখের নয় জেনেও মানুষ যুগে যুগে প্রেমের সাধনা করেছে। সমাজে প্রেম মাত্রই নিষিদ্ধ। পূর্বে প্রেম ছিল নিষিদ্ধ। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমও গ্রহণীয় ছিল না। তবে মনে মনে প্রেম নিন্দনীয় ছিল না। প্রেমের প্রকাশভঙ্গিতেই ছিল যত পাপ। ধীরে ধীরে মেয়েদের বিয়ের বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ পূর্ব প্রেম মেনে নেয়ার যৌক্তিকতা বেড়েছে। তবে সব প্রেমই স্বীকৃত নয়। প্রেম সম্বন্ধে মানুষ সর্বদাই আতংকিত। যদিও কম বেশী প্রেমিক মন সবারই রয়েছে। আর বিয়ে বহির্ভূত প্রেম সমাজ কখনই মানতে রাজী নয়। প্রেমের বিরুদ্ধে সমাজের যেমন বাঁধা নিষেধ আছে। তেমনি সমাজের বিরুদ্ধে প্রেমেরও নালিশ রয়েছে। দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার চতুরঙ্গ মিলনই হলো প্রেম। প্রেম চিরকাল ছিল। চিরকাল থাকবে। প্রেমের জন্য প্রেমিক-প্রেমিকা জাতকুল আত্মীয়-স্বজন ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে। পরকে আপন করে মান-সম্মান সামাজিক মর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে প্রেমের দাবীকেই বড় বলে মনে করে। এই প্রেমের ক্ষয়বৃদ্ধিও আছে। প্রেম যে কয়দিন থাকে সে কয়দিন মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন। যারা এই দিনগুলোর স্বাদ থেকে বঞ্চিত। তারা সত্যিই হতভাগা। জীবনের জোয়ার ভাটার মতো প্রেমেরও জোয়ার ভাটা আছে। মানব মনে প্রেম থাকবেই। এ প্রেমকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

মানুষ প্রেমে পড়তেই পারে। প্রেমে পড়াটা বিচিত্র কিছু নয়, তবে প্রেম পাওয়াটাই দুর্লভ। বর্তমানে অনেকেই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চান বন্ধুত্বের মাঝে। কিন্তু প্রেম আর বন্ধুত্ব কি একার্থক হতে পারে? বন্ধুত্ব কি? বন্ধুত্ব হতে পারে শুধু মাত্র দুটো মানুষের মনের মিল থেকেই। কায়িক ও মানসিক আকর্ষণেই

প্রেমের সৃষ্টি। কিন্তু দুটো মানুষের মনের মিল না হলে বন্ধুত্ব হয় না। মনের মিলের পাশাপাশি ভাবের বিনিময় বন্ধুত্বকে টিকিয়ে রাখে। প্রেমের জগতে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ। ত্রিভুজ প্রেমে প্রেমের মৃত্যু ঘটে। বন্ধুত্ব কিন্তু প্রেমের তুলনায় অধিক সহনশীল। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে অন্য বন্ধুর আগমনে অনেক সময় অন্তরঙ্গতা কমে যায়। মনের দুয়ার রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে সর্বক্ষেত্রে এ কথাটি প্রযোজ্য নয়। তবে প্রেমের ক্ষেত্রে সফলতা এক হলেও বন্ধুর ক্ষেত্রে সফলতা এক নাও হতে পারে। প্রেমিকের উন্নতিতে প্রেমিকা গর্বিত হোন। কিন্তু দুই বন্ধু একই পেশারা হলে, এক বন্ধুর উন্নতিতে অপর বন্ধু ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। কারণ ঈর্ষা মানব মনের সহজাত প্রবৃত্তি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সাফল্যের শীর্ষে আরোহনকারী ব্যক্তি তার অনেক প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে ফেলে। হরিহর আত্মা। এমন বন্ধুত্ব খুবই বিরল। প্রেমের তুলনায় বন্ধুত্বও কোন অংশে কম নয়। শুধু মাত্র প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে বন্ধুত্ব তা ক্ষণস্থায়ী। বন্ধুর দর্শনে বন্ধুর মন খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠে। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর দায়িত্ব ও সহমর্মিতা থাকে প্রবল।

নিষিদ্ধ সমাজ অনুমোদিত প্রেম

স্বদেশ বিদেশ উপন্যাস সাহিত্যের গোড়া পত্তনের কাল থেকেই নিষিদ্ধ প্রেমকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচিত হয়েছে। 'চোখের বালিতে' বিনোদিনীর বিহারীর প্রতি ভালোবাসা নিঃসন্দেহেই ভালোবাসা। তা নিষিদ্ধ ভালোবাসা। মধ্যযুগীয় রোমান্সের নিষিদ্ধ প্রেমের চাইতে ঔপন্যাসিকদের ব্যবহৃত প্রেমের তাৎপর্য অনেক গভীরে। নিষিদ্ধ ভালোবাসার বিষয়টি ঔপন্যাসিকদের নিকট এমন একটি পরীক্ষাগার যেখানে কখনোও না কখনোও ঔপন্যাসিককে প্রবেশ করতেই হবে। মধ্যযুগীয় প্রেমের চরিত্রগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই প্রেমে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। নিষেধ অর্পিত ছিল সামাজিকতার। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমে পারস্পরিক কোন সংশয় ছিল না। নিষেধ বা গোপনীয়তা যতটুকু প্রয়োজন ছিল তা সামাজিক কারণে। কিন্তু ভ্রন্স্কি ও আনার প্রেমের মধ্যে বাইরের কোন নিষিদ্ধতা ছিল না। ছিল অন্তরের নিষিদ্ধতা।

প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের প্রেমাস্পদের চিন্তায় থাকে বিভোর। নারী পুরুষের মনে যখন প্রেম জাগে তখন মনে জাগে আবেগ। প্রেমের বন্যায় যখন ভেসে যায় দু'জন নর-নারী। তখন কামনার আবেগ শরীর ছুঁতে চায়। অনিদ্রা, উদ্বেলতা এবং অন্যমনস্কতা প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনকে ঘিরে রাখে। প্রেমের আয়ু স্বল্প। যদিও প্রাপ্তির সম্ভাবনা কিছুকাল উভয়ের চিত্তকে আন্দোলিত করে রাখে। যদিও মানুষের জীবনের অধিকাংশ বেলাই কাটে নিষ্প্রেমের মাঝেই। কিংবদন্তী প্রেম কাহিনী যুগ যুগ ধরে রোমান্টিকতারই বহিঃপ্রকাশ। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রেমের আকাঙ্ক্ষা মূলত কামনারই বহিঃপ্রকাশ। শরীরের স্পর্শতা ব্যতিত প্রেমকে স্বভাবতই অস্বাভাবিক প্রেম বলা হয়। অচরিতার্থ কামনা জীবনকে অসম্পূর্ণ রাখে। কামহীন প্রেমকে সবাই শ্রদ্ধা করে। কাম যুগ যুগ ধরে মনুষ্য সমাজে নিন্দনীয়। যদিও কাম ছাড়া মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ।

মনুষ্য জীবন অতিশায়িত করা হয় প্রেমের দ্বারা। কিন্তু তা শুধু বৈধ প্রেমের দ্বারাই। প্রেমে জৈবিকতার প্রকাশভঙ্গি সতত। কিন্তু অধিকাংশ সংস্কৃতিতেই প্রেম নিষিদ্ধ। ব্যক্তি সচেতনতার একটি আশ্চর্য পরিণাম হলো এই যে, মানুষ বুঝতে

সমাজ নামক ব্যাপারটি লোক সমষ্টির যোগফলে বিরাজিত নয়। সমাজই বলা হোক কিংবা জীবন সংক্রান্ত ধ্যান ধারণার প্রচলিত মানই বলা হোক, এ সমস্ত কিছুর বাঁধন শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি মানসের মনের নিভৃতে। ব্যক্তি মানসের দ্বিধাদীর্নতাই প্রেমকে উপলব্ধি করার প্রধান সূত্র। কেবলমাত্র প্রেমের নিবিড়তা বা গভীরতা বা ঐ জাতীয় কিছুকে প্রতিপন্ন করা নিষিদ্ধ প্রেমের লক্ষ্য নয়। বিভিন্ন সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা রুচিসমূহের ইতিহাসের পরিবেশের নানা চাপের ফলে যে ব্যক্তি মানস গড়ে ওঠে যাকে নিষিদ্ধ প্রেমের প্রতিমুখে স্থাপন করা হয় তাই স্থিতিস্থাপক শিল্পরূপে সমগ্রভাবে ধরা যায়। "গৃহদাহ" উপন্যাসের সার্থকতা অচলার দিক থেকেই। নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে নীড়। কিন্তু নেই নারী যখন বিকেন্দ্রীভূত হয় তখন নীড় বিনষ্ট হয়, এবং সেটাই হলো গৃহদাহ। গৃহীর জীবন দর্শন কাম কাঞ্চন বিরহিত হতে পারে না। বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়। কিন্তু এই বিষ্ণু প্রথম জীবনে গৃহী ছিলেন।

অচলার জীবন থেকে অন্ধকারের ভার একবারের জন্য মুছে যায়নি। ঘোচেনি তার জীবনের জটপাকানো অসমাধানের পীড়ন। মহিমের রোগ শয্যায় যে অচলাকে দেখা গিয়েছিল। সুরেশের রোগ শয্যায় যে অচলা পাশে ছিল। মাঝুলি গ্রামের অচলা তা থেকে ভিন্ন ছিল। মৃত্যুর আলোকে সুরেশকে সে গ্রহণ করে নিয়েছে। সেই সাথে তাকে মুখাগ্নিও দেবার ইচ্ছা পোষণ করেছে। কিন্তু ঘোষণা করেছে অবিচলিত স্বরে 'আমি তাঁর স্ত্রী নই।' এই একটি মুহূর্তে এই মেয়েটি সমাজের বাঁধা ধরা নিয়মের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার স্বাধীন হৃদয়ের ধর্মকে প্রকাশ করেছে ব্যক্ত অনুভূতির মাঝে। ঐ মুহূর্তে সে অনৈতিক হয়ে যেতে পেরেছিল। প্রাণী মাত্রেরই সহজাত কামপ্রেরণা রয়েছে। মানুষ ও এমন একটি প্রাণী যার ভেতরে কামনা বাসনা রয়েছে। সমাজে বিবাহযোগ্য নারী পুরুষের বয়স বেড়ে চলেছে। এতে হয়তো সমাজ বাড়তি জনসংখ্যার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছে। কিন্তু এতে করে কামনা বাসনাকে অস্বীকার করার কি কোন উপায় আছে? প্রাকৃতিক কারণে যদি শরীর বিদ্রোহ করে সামাজিক নীতিহীনতা বাড়ে বৈ তো কমে না। মানুষের ধর্ম এতে লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু বর্তমানে সমাজের প্রলোভনে বিবেকের সংযম কি করে হবে? বিচিত্র প্রলোভনের সম্ভারে সুস্থ্য বিবেক অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। লঙ্ঘন হয় সামাজিক বিধিনিষেধ। এই সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলতে গেলে দরকার বিবাহ বন্ধন। কিন্তু এই বন্ধন যদি স্বাধীনতা বিপক্ষ হয়। তবে নিরাপত্তা রক্ষণ করা হয় ঠিকই। কিন্তু স্বাধীনতা অরক্ষিত হয়ে পড়ে। বিবাহের স্বাধীনতা যেখানে নেই। সেখানে মানব মন বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা হলেই যে তাতে প্রেম থাকবে এমনটি নয়। প্রেমহীন মিলন সুন্দর নয়। সে মিলন যদিও স্বাধীন ভাবে হয়। তবুও তাতে আত্মার সুখ বিঘ্নিত হয়। নিষ্কাম প্রেম আজও

মানুষের মাঝে বিদ্যমান। কিন্তু কাম যদি প্রেমহীন হয় তবে তাতে আত্মার সুখ বিনষ্ট হয়। কামের ক্ষেত্রে অনিচ্ছা বা অপটুতা নরনারীর সম্পর্কে চিড় ধরায়। সভ্য সমাজে কামকে প্রাধান্য দেয়া হয় না। এতে করে পরিবারের কিংবা সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। বৈবাহিক জীবনে বহুনারী অপরিপূর্ণ কাম জীবন যাপন করে যাচ্ছে। নারী তার অভিযোগ জানাতে পারে না সমাজকে। পুরুষের যদি এক্ষেত্রে কোন অভিযোগ থাকে, তখন সে দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহী হয়। কিংবা বারবনিতার আশ্রয়ে ছুটে যায়। কিন্তু নারী যদি বিদ্রোহী হয় তবে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হয়ে পড়ে।

মানুষের জীবনে কাম ও প্রেম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রেমহীন কাম নিম্নশ্রেণীর প্রাণীস্তরের কাজ। প্রেমের সাধনার কোন বিকল্প নেই। আধুনিক যুগে প্রেমের সাধনা অচল। প্রেমকে ব্যধি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। যে প্রেমে কামনা মেটেনি সে প্রেম হয় কিংবদন্তী। ভাবালুতার যুগে প্রেমিক-প্রেমিকা বিরহে আকুল হয়ে যেত। সেই বিরহী প্রেম আজকাল দুষ্প্রাপ্য। সংসার, সন্তান গৃহস্থালী কাজকর্মের বাইরে প্রেম ঘটেনি অনেকের জীবনেই। যদিও প্রেমের সাধনার সারবস্তু আজ বাসি হয়ে গেছে। প্রেম অপরিহার্য না হলেও কাম অপরিহার্য। নিজের উপর এই সংগ্রাম দেহমনকে পীড়িত করে। প্রেমের সাধনা আজ হয়তো বা অতীত। কিন্তু সাধনার সারবস্তু অতীত হয়ে যায়নি। প্রেমের সাধনার বিকল্প নেই। যার জীবনে প্রেমাস্বাদ ঘটেনি তার জীবনে কামাস্বাদন প্রাণীস্তরের পর্যায় ভুক্ত।

দাম্পত্য জীবন একটা শিল্প

একজন পুরুষ ও নারী বিয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে। বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষের জীবনে পূর্ণতা আসে। প্রতিটি মানুষই একজন সমমনা এবং সহানুভূতিশীল দোসর খোঁজে। বিয়ের মাধ্যমেই মানুষ সঙ্গীর অভাব মিটিয়ে থাকে। একাকী জীবন কোন মানুষেরই কাম্য নয়। জীবনের এই একাকীত্ব ঘুচানোর জন্যই চিরদিনের একজন সঙ্গী প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষই জীবনের নির্ভরতা খোঁজে। সেই নির্ভরতা আর্থিক নির্ভরতা হতে পারে। আবার তা জীবনের অন্যান্য দিকগুলোর নির্ভরতাও হতে পারে। যে নির্ভরতা হৃদয়ের ক্ষমতা দিয়ে অনুভব করা যায়। যে নির্ভরতা নারী ও পুরুষের দেহ ও মনে পরিপূর্ণতা আনে। পৃথিবীতে সব কিছুই আপেক্ষিক। স্থায়ী বলে কোন কিছু নেই। তবে বিয়েটা চিরস্থায়ী না হলেও একে মোটামুটি স্থায়ী বন্ধন বলা যেতে পারে। যে বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে তোলে সামাজিকতা ও সন্তান। কোন স্বামী-স্ত্রীই আশা করেন না তাদের জীবন ঝগড়া বিবাদের মধ্যে কাটুক। প্রতিটি মানুষই তার জীবনে সুখের পরিকল্পনা করে থাকেন এবং সেই পরিকল্পনায় তার জীবন সঙ্গীকে স্থান দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই কল্পনার রাজ্যে মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ থাকে না। স্বপ্ন সাধ পূরণের জন্য সকলকেই বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়। শুরু হয় বাস্তবতার আলোকে নতুন জীবন। এরপর দাম্পত্য জীবনের নতুনত্ব ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে মনের অমিল ও সমঝোতার অভাব ঘটে থাকে। বিভিন্ন কারণে ভুল বুঝাবুঝি ঘটে থাকে। প্রায় প্রতিটি মানুষেরই কথায়, কাজে ও চিন্তায় প্রচুর অমিল দেখা যায়।

বিয়ের আগে প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরের ব্যাপারে যেমন উদার দৃষ্টি ভঙ্গি থাকে। বিয়ের পরেই সে উদারতা হ্রাস পায়। একে অপরকে অধিকার করতে চায়।

যে প্রেম প্রেমাস্পদের পায়ে শৃঙ্খল পরায় তা প্রেমের নামে অধিকার বৃত্তি। বিয়ের পরপরই স্বামী-স্ত্রীর রোমাঞ্চের মৃত্যু ঘটে।

এর পিছনে সবচাইতে বড় কারণ হলো সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার। প্রতিটি

সম্পর্কের মাঝেই পরিমিতিবোধ থাকা উচিত। সম্পর্কের বাড়াবাড়ি প্রতিটি সম্পর্কের জন্যই ক্ষতিকর। এই পরিমিতিবোধ প্রতিটি সম্পর্কের মাঝেই আমরা রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেই আমরা বেহিসেবী হয়ে পড়ি।

একজন স্বামী বা স্ত্রী যারা কিনা বাইরে কাজের ক্ষেত্রে পারদর্শী তারাই তাদের যত বদভ্যাস ঘরে এসে প্রয়োগ করে। সংসার চিন্তা, অর্থচিন্তা, সন্তান-সন্ততির চিন্তা এসে নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা পড়ে যায়। প্রেম করার সময় যে প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়ে উভয়ের জন্য আত্মাহুতি পর্যন্ত দিতে পারে। দেখা যায় বিয়ের পর তারাই পরস্পরের প্রতি কতটা অমানবিক। পারস্পরিক জীবনে ব্যবহারের পরিবর্তন হতে শুরু করে ধীরে ধীরে। সম্পর্ক পুরোনো হতে হতে এমন এক পর্যায়ে এসে ঠেকে যেখানে না থাকে কোন হারাবার ভয় কিংবা না থাকে কোন আবিষ্কার। উভয়ে উভয়ের নাড়ী নক্ষত্রের খবরটুকু নিতে পর্যন্ত কার্পণ্য করে না। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা এমনই দাঁড়ায়— ইলাস্টিক বেশী টানলে যেমন এর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় অথচ ছেঁড়েও না আবার পূর্বাবস্থায় ফেরেও না। বিশ্রী এক রূপ ধারণ করে। আবার যারা অধিকার বোধ সম্পন্ন মানুষ তাদেরকে দেখা যায় তোয়াজ করে চলছে। দেখা যাচ্ছে সেখানে শ্রদ্ধাভক্তির চাইতেও তোষামোদ প্রকট হয়ে উঠছে।

প্রেমিক-প্রেমিকার মনে তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে ঈর্ষা আসাটা বিচিত্র কিছু নয়। কারণ মানুষ মাত্রই তার প্রয়োজন মেটানোর প্রতি সর্বদা আগ্রহী। অপরের প্রয়োজন মেটানোর উপায় দেখে সেই অনুযায়ী নিজের প্রয়োজন মেটাতে না পারলেই মানুষের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। কিন্তু ঈর্ষা হলেই তো আর চলবে না। নিজের সামর্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখেই এগুতে হবে। নতুবা লোভ মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে। ঈর্ষা যেন এমন না হয় যা অপরের পায়ে শেকল পরিয়ে দেয়। একজোড়া নর-নারী যখন প্রেমে পড়ে তখন তাদের মাঝে মিথ্যাটা এক ধরনের শিল্প হয়ে যায়। যেমন— তোমার এক কথায় আমি হিমালয় অতিক্রম করতে পারি। খোলা আকাশের নীচে রাত্রিযাপন করতে পারি কিংবা বটতলায় থাকতে পারি।

এমনও দেখা যাচ্ছে প্রেম হয়তো জীবনে কয়েকবারই এসেছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বারবারই সে প্রেমিক-প্রেমিকার নিকট প্রথমজনই হতে চাচ্ছে। সবার কাছে একই মিথ্যাচার করা হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে মিথ্যাটা আরও বেশী পরিমাণে প্রকট হয়ে উঠে। প্রতিটি স্বামী-স্ত্রীই বিশ্বাসের উপর ঘর করেন। প্রতিটি স্বামীই ভেবে থাকেন তার স্ত্রীই তার জীবনে প্রথম নারী। প্রতিটি স্ত্রীই ভাবেন তার স্বামী তার জীবনে প্রথম পুরুষ। বিষয়টি হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যৌবনের দাবী মেটাতে গিয়ে বিয়ের পূর্বে যদি অসতর্ক মুহূর্তে কিছু ঘটেও যায়। সেটা বিবাহিত জীবনে মিথ্যার বুননে আবৃত করা হয়। এ মিথ্যা অনেক ঘরকে ভাঙন থেকে রক্ষা করে।

স্বামী-স্ত্রী কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার প্রস্থান অথবা মৃত্যুতে কি অপরজনের জীবন কখনও থেমে গেছে? নাকি থেমে থাকে? যদিও তাদের উপস্থিতিতে বলা হয় তোমাকে ছাড়া আমার কোন গতি নেই। অথচ সেই মানুষদেরকেই দেখা যাচ্ছে যে কোন একজনের অবর্তমানে অপর একজন সাথী খুঁজে নিচ্ছে। জীবনের প্রয়োজনে মানুষ তা করছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা এ সুযোগ পায় বিধায় এর সদ্ব্যবহার করে। নারীদের এ সুযোগ থাকে না বলে তারা কমই জীবনের দাবী মেটাতে পারে।

নর-নারীর হৃদয়ে যদি প্রেমের যোগ না থাকে তবে বিয়ে সার্থক ও সুন্দর হতে পারে না। নর-নারী বিয়ে করে ছেলেপুলে নাতী-নাতনীর মুখ দেখার জন্য। এরই মাঝে তাদের কান্না হাসি। অথচ দু'জন দু'জনের মন বোঝার চেষ্টা কখনও করে না। অধিকাংশ দাম্পত্য জীবনে অসুখী হওয়ার মূলে রয়েছে বেমানান জুটি। দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ দম্পতিই মন, চেতনা, রুচি, ভাব ভাবনা, সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ভিন্ন।

বিয়ের পর কিছু হাঁড়িপাতিল কেনা, বাসা ভাড়া করা, দেহের ক্ষুধা মিটিয়ে বংশ রক্ষা করা হলো, অথচ এতে কোন অন্তরের সম্পর্ক না হলে তাকে দাম্পত্য জীবন বলা চলে না।

কারণ দাম্পত্য জীবন একটা আর্ট। দাম্পত্য সম্পর্ক মানে পরস্পরের প্রতি জুলুম করা নয়। বিয়ের পর যদি দম্পতিরা সুখী হতে চায় তবে পূর্ণ অধিকার না খাটিয়ে অধিকারকে অর্ধেক করে নেয়া উচিত। সেই সাথে কর্তব্যকে দ্বিগুণ করে নেয়া উচিত। এবং বিয়ের মূল শর্তই হলো নিজেদেরকে পরিতৃপ্ত করা। বিয়ের মাধ্যমে একজোড়া নর-নারী নিজেরা পরিতৃপ্ত এবং সুখী না হলে তাকে বিয়ে বলা চলে না। বিয়েতে স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক অসামঞ্জস্য বিয়েকে শান্তি ও আনন্দপূর্ণ করতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর উন্নত মানসিক পরিণতি দাম্পত্য সুখ বর্ধিত করে

স্বামী-স্ত্রীর মানসিক পরিণতির স্তর যত উন্নত হবে ততই দাম্পত্য সুখ বর্ধিত হবে। বয়স বাড়লেই যে, মানসিক পরিণতি আসবে এমন কোন কথা নেই। আবার লেখাপড়া জানলেই যে কেউ একজন বিদ্বান বা বুদ্ধিমান হবে এ ধারণাও ভুল। মানসিক পরিণতির উপরই খাপ খাওয়ানো এবং সমঝোতার মনোভাব গড়ে উঠে। যার মানসিক পরিণতি যত উন্নত সে তত বেশী অন্যের অনুভূতি ও সমস্যা বুঝতে পারবে। ন্যায় অন্যায় ও দায়িত্ব বোধের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি অপরিবর্তনীয় এবং অনমনীয় মনোভাব থেকে থাকে, তবে তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। মানসিক স্তর উন্নত হলে বোঝার ক্ষমতাও বেশী থাকবে। পৃথিবীতে দুটো মানুষ কখনও এক হয়ে জন্মায় না। তাই যে মানুষ যুক্তিতর্কের আলোকে সব কিছু অনুধাবন করতে পারবে এবং মানুষের আচরণগুলোকে বোঝার চেষ্টা করবে সে তত উন্নত মানুষ হবে। পরিবারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মন-মানসিকতা যত উন্নত হবে পারিবারিক স্থিতিশীলতা ততই সুন্দর থাকবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কারণে যদি যোগাযোগের মাধ্যমে হ্রাস পায় তবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের নিকট থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে। উভয়ের মাঝে শ্রদ্ধাবোধ থাকলে প্রেম সব চাইতে বেশী স্থিতিশীল হয়ে থাকে। একে অপরের নিকট মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে থাকে। অথচ এ সমাজে কোন স্বামী-স্ত্রীই পরস্পর বন্ধু হয়ে উঠতে পারে না। সাধারণত যে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। স্বামীর অসুস্থতায় স্ত্রী পরিপূর্ণভাবে সেবা দান করে। স্ত্রীর সাংসারিক প্রয়োজন অপ্রয়োজনগুলো স্বামী পূরণ করে যাচ্ছে। এদেরকে আমরা সুখী ভেবে থাকি। দেখা যায় সংসারের নিত্যনিমিত্তের ঝামেলা নিয়ে কিংবা সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে স্বামী-স্ত্রী সব সময়ই আলাপ আলোচনায় রত। মাঝে মধ্যে সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঘোরাফেরাও হয়। পরবর্তীতে দেখা যায় দাম্পত্য জীবনে প্রেমের চাইতেও দায়িত্ব কর্তব্যের বেড়াজালে মানুষ

অধিক মাত্রায় নিজেকে বন্দী করে ফেলে। ধীরে ধীরে মানুষ অভ্যস্থ জীবনে প্রবেশ করে। আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রী প্রেমিক-প্রেমিকা হতে পারে না। প্রিয় বন্ধু-বান্ধবী কিংবা দুর্দান্ত প্রেমিক-প্রেমিকা বিয়ের পর খাঁটি স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়। সেখানে না থাকে কোন প্রেম না থাকে বন্ধুর সহমর্মিতা। দুজন মানুষ একে অপরের প্রতি অনুভব অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারেন না। যার সাথে ভাবের সঙ্গতি হয় না, প্রাণের সুর মেলে না তাকে ভালোবাসা বলা যায় না। দাবী করে কখনও ভালোবাসা পাওয়া যায় না। ভালোবাসা দিলেই ভালোবাসা পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষে মানুষে ভালোবাসা দেয়ার ব্যাপারেই যত গরমিল দেখা যায়। মানুষ মানুষের সাথে মিলিত হয় বাইরের প্রয়োজনে। সে প্রয়োজন কখনও বন্ধুত্বের, কখনও বা সৃষ্টির আবার কখনও তা স্বার্থের প্রয়োজন। তাই প্রকৃত অর্থে মানুষ স্বভাবতই একা। মানুষের মন এ সংসারে সঙ্গীহীন।

প্রেমহীন দাম্পত্য জীবন

খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এ উপমহাদেশে বিয়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না। যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারী পরস্পর মিলিত হতে পারত। আদিসাম্যবাদী যুগে প্রচলিত ছিল যুথবিবাহ। জনযুগে আসে অনিশ্চিত মিথুন বিয়ে। এরপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আধুনিক বিবাহ প্রথা চালু হয়। নারীর ভূমিকা হয় দাসীর ও বংশবৃদ্ধির মূল্যবান সামগ্রী রূপে। সামন্ত যুগে নারীর মূল্য নির্ধারিত হতো সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা এবং বিনিময় মূল্য নির্ধারনের উপর।

বর্তমানে বিবাহ নামক যে সম্পর্কের জন্ম তা পরিবর্তিত ও পরিশীলিত হয়ে এক ভিন্নরূপ লাভ করেছে। শুধুমাত্র শারীরিক সম্পর্ক, সন্তান লালন-পালনের মাঝেই বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে থাকা চাই হাসি আনন্দ, দুঃখ-বেদনা, সৌহার্দ-মমতা সর্বোপরি প্রেম, বিশ্বাস ও নির্ভরতা। কিন্তু বিয়ের বছর পাঁচেকের মধ্যেই দম্পতিরা প্রেমহীন আকর্ষণহীন এক ভয়াবহ জীবন যাপন করে থাকে। নিত্য নৈমিত্তিক দাম্পত্য জীবনে প্রেমের আবেগে পড়ে যায় ভাটা। নিত্যদিনের সংসার জীবন, বাচ্চার স্কুল, কাজের লোক, বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের মতো দাম্পত্য সম্পর্কও দায়িত্ব পালনের মতো পর্যায়ে এসে ঠেকে যায়।

যে যার মতো সংসার ধর্ম পালন করেন। স্বামী অফিস করেন। স্ত্রী সংসার ধর্ম পালন করেন। ধীরে ধীরে যৌথ জীবনের প্রাণটা হারিয়ে যায়। একের প্রতি অন্যের কোন রকম অভিযোগ থাকে না। এক সময়ের ঝগড়াঝাটি সমঝোতায় রূপ নেয়। পরবর্তীতে একের প্রতি অন্যজন আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন।

বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে গেছে। কিংবা সম্পর্কটা রয়ে যায় একটা জোড়া দেয়া সম্পর্কের মতো। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই উষ্ণতা হারিয়ে যায়। দাম্পত্য জীবনের এ সমস্যার মূলে রয়েছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। পূর্বে মানুষ যৌথ পরিবারে জীবন যাপন করতো। স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ কম হতো। মেয়েরা সন্তান উৎপাদন, লালন-পালন এবং সংসারে শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ননদ এদের দায়িত্ব পালন করতো। এতে করে স্বামীর সাথে প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব

হতো না। বর্তমানে খাওয়া পরার মাঝেই নারীদের চাহিদা আর সীমাবদ্ধ নেই। নারীরা বর্তমানে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন।

সমাজে মেয়েদের ক্ষমতা ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে। সংসারে নারীর ভূমিকা শুধুমাত্র সন্তানের জননী এবং গৃহকর্ত্রীর মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের অন্যান্য অংশের মেয়েদের সাথে নিজেকে তুলনা করছে মেয়েরা।

বর্তমানে নিজেদের পছন্দের পাত্র-পাত্রীকে বিয়ের সংখ্যা বেড়েছে। বিয়ের পূর্বে পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বিয়ের পরেই হারিয়ে যাচ্ছে। জীবন সংগ্রামে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো। নিত্যদিনের অভ্যস্থতা জন্ম দিচ্ছে হাতাশার। ঘরে বাইরের প্রবল মানসিক চাপ। একের প্রতি অপরের সহমর্মিতার অভাব বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা একঘেয়েমী জীবনের জন্য দায়ী।

ভালোবাসা হারানোর জিনিস নয়, অথচ চর্চার অভাবে আমরা ভালোবাসাকে হারিয়ে ফেলি। ভালোবাসাকে প্রতিনিয়ত প্রকাশ করতে হয়। শুধুমাত্র অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হলেই মনের খোরাক মেটে না। পরস্পরের মনের চাহিদাকে ভুলে গেলেই দাম্পত্য জীবন একসময় প্রেমহীন হয়ে যায়। বিয়ে মানেই প্রেমের সমাপ্তি হওয়া উচিত নয়। প্রেম একটা অর্জিত গুন। অর্জিত যে কোন কিছু ধরে রাখতে চাইলে চর্চার প্রয়োজন। নিজেদের অমনোযোগ এবং অবহেলার জন্য জীবন থেকে প্রেম হারিয়ে যায়।

পশুদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি জৈবিক আকর্ষণ ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি নেই। যা মানুষের রয়েছে। এরই নাম প্রেম। প্রেম সহজাত অনুভূতি নয়। এটি মানুষের অর্জিত অনুভূতি। এর জন্য চর্চার প্রয়োজন। এটি হাজার বছরের মানসিক চর্চার ফসল। ভালোবাসা বৃক্ষের ন্যায়। বৃক্ষ যেমন রোদ, বৃষ্টির অভাবে তার সতেজতা হারায়। আগাছা নিংড়ে না দিলে মরে যায়। দাম্পত্য ভালোবাসাও তেমনি চর্চার অভাবে তার সজীবতা হারিয়ে ফেলে। দাম্পত্য হয়ে পড়ে প্রেমহীন।

দাম্পত্য ভালোবাসা

জন্ম গ্রহণ করা মানব জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ। জীবন ধারণের জন্য যতই সংগ্রাম করতে হোক না কেন মানুষ তার জন্য সদা প্রস্তুত। নিদারুণ দুঃখ কষ্টে পতিত না হলে কোন মানুষই তার জন্মের জন্য অসুখী নয়। জন্মের সময় একজন মানব শিশু কেমন হবে তা কিন্তু মানবীয় বিচারের উপর নির্ভরশীল নয়। আমাদের সমাজে আমরা ভালোবাসার অনুভূতিকে মূল্য দিয়ে থাকি। দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক ভালোবাসাই পারিবারিক সুবিধা অসুবিধাগুলোকে কাটিয়ে তুলতে সক্ষম। শুধুমাত্র ভালোবাসার জোরেই দুটো মানুষ তাদের বিবাহিত জীবনের সংকটগুলো মোকাবেলা করতে সক্ষম। মানুষ দুটো কারণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রথমত সঙ্গীর জন্য দ্বিতীয়ত সন্তান লাভের জন্য। পারস্পরিক সঙ্গ এবং সুখভোগ বিবাহিত জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। বিবাহিত জীবনে এরূপ কোন কিছুর অভাব ঘটলেই দাম্পত্য জীবনে অস্থিরতা ও বেদনা দেখা যায়। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে না উঠলে শরীর ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এরপরও শারীরিক সম্পর্কও বিবাহিত জীবনে অত্যাবশ্যক। বিবাহিত নর-নারীর শারীরিক সম্পর্ককে কোনভাবেই অবজ্ঞা করা চলে না। প্রেমের বাহ্য দিক যে অভ্যন্তরীণ দিককে নিয়ন্ত্রণ করে এ কথা অস্বীকার করার কোনই উপায় নাই। বিবাহে শারীরিক সম্পর্ক বিশেষ ভাবে আনন্দ দান করলেও শুধুমাত্র শারীরিক আকর্ষণ জীবনের পূর্ণতা দানে সক্ষম নয়। শুধুমাত্র শারীরিক সখ্যতা দিনে দিনে অতৃপ্তিকর ও তিক্ততার মূল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই সাথে মানসিক ও আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণ শারীরিক সখ্যতার আনন্দকে স্থায়ী ও তৃপ্তিকর করে।

দাম্পত্য জীবনে সুখ দুঃখের অংশীদারিত্ব যত বেশী থাকবে, সাধারণ বিষয়গুলোতে যত বেশী অংশগ্রহণ করবে, ততই উভয়ের সম্পর্কে অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। শুধুমাত্র শারীরিক নির্ভরতা নয়। যত মানসিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে, ততই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান হবে। একজোড়া বিবাহিত নর-নারী যদি পারস্পরিক সাহচর্য, একে অপরের প্রতি সম্মান এবং সাহায্যের আদান-প্রদান করতে পারে। কেবল মাত্র তখনই তাদের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে

উঠতে পারে।

কেবলমাত্র সংযত জীবন যাপনই বিবাহিত জীবন সুখের করে গড়ে তলতে সক্ষম। যে যত বেশী ইন্দ্রিয়কে দমনে সক্ষম তার বৈবাহিক জীবন ততই সুখকর। এমন অনেক নর-নারী আছেন যারা মানসিক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে চলেন। মানসিক উত্তেজনা অতিভোজনের মতোই। যে যত বেশী মানসিক ক্ষমতার অধিকারী, সে তত বেশী নিজ ইন্দ্রিয় দমনে সক্ষম। ইন্দ্রিয় দমনে অপারগ হলে নর-নারীর পারস্পরিক প্রেম ও অনুরাগ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে গৃহবিচ্ছেদ ঘটে থাকে। এর ক্ষতিকর শিকার হয় সন্তানরা। বিবাহিত জীবনে নর-নারী একে অপরের সমালোচনা বা দোষ ত্রুটি নিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করলে ধীরে ধীরে তা একসময় বিরক্তিতে ভরে উঠে। একসময় ঘর থেকে প্রেম নিষ্ক্রান্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাথে একত্রে কিছু করার পরিকল্পনা করলে, কিংবা কিছু সময় একসাথে কাটালে উভয়ের মাঝে সখ্যতা বাড়ে। পরস্পরের মাঝে যে নতুন ক্ষমতা ও সহযোগিতা অনুভূত হয় সেইভাবে চলা উচিত এবং সেই সাথে উভয়ে উভয়ের প্রশংসা করা উচিত।

পারিবারিক মিলন মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে

ধনী কি গরীব প্রতিটি মানুষের জীবনেই পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। পারিবারিক জীবন মানুষের জীবনের নিরাপত্তা এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনের সুযোগ করে দেয়। দুঃখ ও উদ্বেগের মুহূর্তটিতে গৃহহারা ব্যক্তির পাশে দাঁড়াবার কেউ থাকে না। পরিবার মানুষকে বিপদাপদ থেকে সংরক্ষণ করে রাখে। মানুষের হৃদয়াবেগ মূল্যায়িত হয় পরিবারের মাঝেই। ছুটির অবকাশে মানুষ যখন পারিবারিক উৎসবে মেতে ওঠে তখন গৃহহারা নর-নারী কিংবা শিশুর জীবন হয় হৃদয়বিদারক।

আনন্দ এবং বেদনার যে কোন অবস্থার মধ্যেই মানুষ তার পারিবারিক সম্পর্ককে একটি নির্দিষ্ট বিশেষ ধাঁচে গড়ে তুলতে চায়। বাড়ীতে আবেগপূর্ণ আবহাওয়ার অর্থ পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক। যে পরিবারে ভালোবাসার কোমল স্পর্শ রয়েছে, সে পরিবারের সব কিছুই মধুর। যে পরিবারে ঝগড়া এবং কোন্দল লেগে থাকে সে পরিবারের আবহাওয়া তিক্ত। পরিবারে মানুষদের ভেতরে মানবীয় দুর্বলতা থাকা দোষের নয়। কারণ মানুষ মাত্রই মানবীয় দোষ গুনের অধিকারী। একমাত্র কল্পনার জগতের বাসিন্দা ব্যতিরেকে মানুষ সারাক্ষণ একে অপরকে ভালোবাসার ধারণা দিতে অক্ষম। একই সঙ্গে বাস করতে গেলে রাগ, দুঃখ, দুঃশ্চিন্তা ইত্যাদি প্রকাশ পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং পরিবারের লোকেরা একে অপরের আশা-আকাংখা আশা-নিরাশা সম্বন্ধে অবগত থাকাই ভালো। তবে মনে রাখা উচিত এতে করে যেন শিশুরা আতংকগ্রস্থ না হয়। পারস্পরিক ভালোবাসার লেনদেনে যেন বাঁধার সৃষ্টি না হয়। একমাত্র পারিবারিক পরিবেশের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যকার তিক্ততার সম্পর্ক দূরীভূত হয় এবং পারিবারিক মিলন মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এমন কিছু ব্যক্তি আছেন তারা তাদের পরিবারের লোকদের সম্মুখে আবেগ প্রকাশ করতে নারাজ। আবেগ প্রকাশিত না হলে একের প্রতি অন্যের আবেগীয় সম্পর্ক সৃষ্টি হবে না। অযথা বাবা-মাকে সন্তানরা ভয় করতে শিখবে।

একের প্রতি অন্যের অনুভূতির স্বীকৃতি পারস্পরিক স্নেহ-মায়া-মমতা বৃদ্ধি করে।

বর্তমানে বৃহৎ পরিবার ভেঙ্গে ক্ষুদ্র পরিবার গঠিত হচ্ছে। বহু নারীকে জীবিকার্জনের জন্য ঘরের বাইরে যেতে হচ্ছে। তাই সাবেক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী বর্তমান পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আধুনিক পরিবারে জটিল সংসারের কর্মব্যস্ততার দরুন পুরোনো অনেক ভালো জিনিসকে বর্জন করতে হচ্ছে। ধরুন পূর্বে শিশুরা যৌথপরিবারের লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা পেতো। বিভিন্ন মুখরোচক খাবার ঘরে খেতে পারতো। কিন্তু বর্তমানের ব্যস্ত জীবন যাপনের জন্য শিশুরা এসব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই নতুন জীবনের কর্মব্যস্ততার সঙ্গে পুরোনো ভালো জিনিসগুলোকে গ্রহণ করে নেয়াই সকলের জন্য আবশ্যক। পরিবারের প্রতিটি মানুষই ভিন্ন ব্যক্তিত্বের। যেমন— কারো কারো ক্ষেত্রে সামান্য ইশারাতেই কাজ হয়। আবার কাউকে অনেকক্ষণ ধরে উপদেশ দিলেও কোন কাজে আসে না। অনেক পরিবারে শিশু কিংবা নারীকে মানুষ হিসাবেই মর্যাদা দেয়া হয় না। পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা যদি শিশুদেরকে মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন করে তবে শিশুরাও অনেক ক্ষেত্রে বড়দের মতো পারিবারিক কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। শিশুদের ভাবনার প্রতি খেয়াল না রেখে শুধুমাত্র সযত্ন শিক্ষা এবং ট্রেনিং দানের মাধ্যমেই উপযুক্ত ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পারিবারিক দায়িত্ব মানেই পূর্ণ কর্তৃত্ব নয়। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নিজেদের দোষ ত্রুটি গোপন করে শিশুদের উপদেশ দিলে শিশুরা কথায় ও কাজে মিল না পেয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়বে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শিশুদের প্রতি ভালোবাসা কিংবা প্রশংসনীয় মনোভাব প্রকাশ করেন না। কিন্তু রাগের অনুভূতি ঠিকই প্রকাশ করে থাকেন।

পারিবারিক বেষ্টনীর মাঝে একজন মানব শিশু বুঝতে শেখে মানুষের সম্পর্কের মাঝে রাগ বা বিরক্তি সাময়িক। পারিবারিক ভালোবাসাটাই চিরস্থায়ী।

একজন মানব পারিবারিক বিপদ, দুর্যোগ এবং সংকটের মধ্য দিয়েই বড় হয়ে ওঠে। সে জীবনের সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে সচেতন হয়। এবং পরবর্তী জীবনে তা সুদূর প্রসারী ফল দান করে। পারিবারিক জীবনে সন্তান-সন্ততিকে এমনভাবে আবৃত করে রাখা উচিত নয় যাতে করে তাদের স্বাধীন চিন্তা ব্যহত হয়ে পড়ে। পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের উচিত নয় ছোটদের প্রতি অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করা। ছেলেবেলা থেকে যদি শিশুদের উপর অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করা হয় তবে সেই শিশু স্বনির্ভর হতে পারে না। নিজস্ব সত্বা হারিয়ে ফেলে প্রভাব বিস্তারকারীর মনের মতো করে গড়ে উঠে। এসব শিশুরা বড় হয়ে নিজের মতামত প্রকাশে ব্যর্থ হয়। পারিবারিক জগৎ মস্তকোপরি ছাদের মাঝে সীমাবদ্ধ কোন জগৎ নয়। এ হচ্ছে প্রথম আনন্দ, অপমান আর অনুভূতির জগত। পারিবারিক জগতের মাঝেই আমরা জানতে পারি বৃহৎ বিশ্বকে। এ হচ্ছে সে জগৎ যেখানে আমরা ঘুমাই, পড়ি, কথা বলি এবং আবার ফিরে আসি। আমাদের এ জীবন বৈচিত্র্যময়। পরিবার

হচ্ছে ক্ষুদ্র এক সমাজ। পরিবারের স্নেহ ভালোবাসায় একজন মানব শিশু দেখতে পায় পারিবারিক মহত্ব, ঔদার্য সূক্ষ্মানুভূতি, নিঃসঙ্গতা, অশিষ্টতা ইত্যাদি।

মানুষের বিকাশ এক জটিল ও শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া। এখানে মানুষের সমস্তকিছুই গুরুত্বপূর্ণ জীবন বিকাশে সামান্য ভুল মানুষকে বিপথগামী করে তোলে। সময়ের ব্যবধানে জীবনের সুখকর ও আনন্দদায়ক সবকিছু থেকে মানুষকে যে বাদটি বিচ্ছিন্ন করে রাখে তা ধীরে ধীরে গভীরতা লাভ করে। ধীরে ধীরে মানুষ অপকারিতা উপলব্ধি করে। এবং নির্দয় আচরণ শুরু করে। যে পরিবারের মানুষ পরস্পর ভালোবাসে সে সকল পরিবারে দৃঢ় ও প্রত্যয়ী মানুষ গড়ে ওঠে। আমরা জানি যে, মা বাবার ভালোবাসা তুলনাহীন। মা বাবার ভালোবাসার মাঝেই একজন মানব শিশুর মধ্যে মমতা ও মহত্ব গড়ে ওঠে। মা বাবার ভালোবাসায় সন্তান উদার স্নেহশীল ও অমায়িক হয়ে গড়ে ওঠে।

আবার অতি স্নেহ সন্তানদেরকে সহজ জীবন যাপনে অভ্যস্থ করে তোলে। সন্তানদের চাহিদার কোন শেষ থাকে না। এরা কোনরূপ বাধানিষেধ মানে না। অনেক সময় গায়ের জোরে নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূরণের জন্য আইনবিরোধী কাজও করে থাকে।

সন্তানের জীবনের প্রতি উদাসীন থাকা উচিত নয়। কারণ তত্বাবধানহীনতা সন্তানকে উচ্ছৃংখল করে গড়ে তোলে। শিক্ষাদীক্ষা এবং সন্তানের তত্বাবধান দুটো ভিন্ন জিনিস। সন্তানের জীবন যাপন পদ্ধতির প্রতি সর্বদা মনোযোগ ও আগ্রহ থাকা উচিত। কারণ সন্তানের প্রতি অমনোযোগ তার জীবনে বিপদ ডেকে আনতে পারে। কারণ কিশোর বয়সে নিজেদের নিয়ন্ত্রণের অভাবে সন্তানরা মিথ্যা কৈফিয়ত দিতে শেখে। অন্যের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এই বয়সে যে মানুষ কিশোরদের মাঝে আগ্রহ গড়ে তুলতে পারে। সেই মানুষকেই তারা অনুসরণ করে থাকে। এই কারণে সঙ্গ দোষে ভালো খারাপ হয় এবং খারাপ ভালোতে পরিণত হয়ে পড়ে। তত্বাবধানহীনতার অভাবে সন্তানগণ অনৈতিক পথে পা বাড়ায়।

অভিভাবকের শৃংখলার অভাবে সন্তানগণ হিতাহিত জ্ঞান শূন্যভাবে বেড়ে উঠে, যাত্রার পরবর্তী জীবন যাপনের জন্য অতি ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়। সন্তানের মাঝে স্বার্থপরতা, আলসেমি এবং মিথ্যা বলার প্রবণতা সন্তানদেরকে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং নিষ্ঠুর ভাবে গড়ে তোলে।

সন্তানরা বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের জ্ঞান, যোগাযোগ এবং পরিচয়ের পরিধি বিস্তার লাভ করে।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষক-শিক্ষিকা বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের সাথে যোগাযোগ রাখলে তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল

হওয়া যাবে। এছাড়াও নিয়ম শৃঙ্খলা ব্যক্তি জীবনকে উন্নত করে। তাই প্রতিটি কাজ যাতে নিয়ম অনুযায়ী করা হয় এ ব্যাপারে পরিবারের লোকজনকে সচেতন থাকা ভালো। কেউ যদি রাতের বেলা বাইরে আড্ডা দেয়। কিংবা ফিরতে দেরী করে। তবে তার আচরণের সঠিক সীমা নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। পরিবারের লোকদেরকে ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে রাখা পরিবারের অপরাপর লোকজনের নৈতিক দায়িত্ব। তাদের ভেতর যাতে অন্যায় অবিচার প্রবেশ করতে না পারে তা সুসংগঠিত করে দেয়া উচিত। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক মানুষই নিজের মতো করে জীবনের সংস্পর্শে আসে। এটা এড়িয়ে যাবার কোনই উপায় নেই। কেউ অকৃতকার্য হলে হতাশাগ্রস্ত হয় এবং খিটখিটে স্বভাবের হয়ে পড়ে। কাউকে অকৃতকার্যতা সংগ্রামে পরিণত করে। মনোবল যোগায়। সাহসী করে তোলে। মানুষের মতো মানুষ করে তোলে। এরা বাধা বিপত্তিকে ভয় পায় না। এরা নির্ভিক, অটল।

দায়িত্ব কোন সাধারণ বিমূর্ত ধারণা নয়। মানুষের দায়িত্ব থাকতে পারে নিজের প্রতি, বিবেকের প্রতি, সমাজের প্রতি। একজন সন্তানের প্রথম শিক্ষক ও আর্দশ তার মা-বাবা। পরিবারে থেকেই শিশুরা নীতি ও উচ্চ দায়িত্ববোধ শিখে থাকে।

সন্তানের ভালোবাসা

পিতামাতা তার সন্তানকে ভালোবাসেন। এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু পিতামাতা তার সন্তান সন্ততিকে এমনভাবে আবৃত করে রাখেন যা সন্তানের স্বাধীন চিন্তাকে ব্যহত করে দেয়। যেখানে মা বাবার অত্যাধিক প্রভাব বিদ্যমান সেখানে মা বাবা যিনিই সন্তানের সংস্পর্শে বেশী আসেন তার প্রভাবই বেশী অনুভূত হবে। সন্তান পুত্র কি কন্যা তা বিচারের উপর প্রভাবের মাত্রা নির্ভর করে।

মানুষের সৌন্দর্যবোধ বিচার করা হচ্ছে এমন এক ব্যাপার যেখানে জড়িয়ে আছে শিল্পকলা ও নৈতিকতা। সমাজের সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে বিধিবিষয়ক শিক্ষা। শিল্প এমন এক বিষয় যা আমাদের সন্তান সন্ততিদের গভীর এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি দান করে। শৈশবে শিশু অন্যের বুদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়। মা, বাবা, শিক্ষক যে অভিমত পোষণ করেন। তা শিশু আদর্শ হিসাবে ধরে নেয়। অবশ্য যদি অন্য কোন উৎস হতে বিরুদ্ধ মতবাদের স্রোত প্রবাহিত হয়। তবে তারা অন্যত্র নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর মা বাবা তার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে সন্তানগণ তাদের মাতা পিতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের জীবনের দাবী মেটাতে সচেষ্ট থাকে। আরো দেখা যায় মা বাবা বার্ধক্যে অক্ষম হলে তাদের সন্তানগণ তাদের রক্ষা করবে এ জাতীয় আশা পোষণ করেন। এভাবে মা বাবার প্রতি সন্তানের কর্তব্য এ সমাজে নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। ছোট শিশুর নির্ভরতা সুখকর কিন্তু বয়স্ক সন্তানের স্বাধীনতা দূর্বিসহ মনে হয়। মা তার সন্তানকে স্তন্য দান করে আনন্দিত হোন। কিন্তু সেই সন্তানের অসহায় ভাব যখন কমে যায়। তখন মায়ের আনন্দও কমে আসে।

মানসিক নির্ভরতার জন্যই মা বাবা সন্তানের অসহায় অবস্থাকে দীর্ঘতর করতে চান। সন্তান মা, বাবার স্নেহের বাইরে যখন চলে যেতে চায়। তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। বিয়ের পূর্বে যে মেয়ে মায়ের উপর নির্ভরশীল বিয়ের পর স্বভাবতই সে মেয়ে স্বামীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এভাবে মেয়েদের পরনির্ভরশীল গড়ে তোলা হলে একসময় কোন পুরুষকেই সে সঙ্গী হিসাবে নিতে পারবে না। অথচ দাম্পত্য জীবনের মূল আনন্দই হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর দাসত্ববৃত্তি নয়।

স্বামী স্ত্রীর মাঝে "সখ্যতা"। সন্তানের প্রতি মা, বাবার আচরণ যদি যথাযথ হয় তবে সন্তানও অনুরূপভাবে গড়ে উঠবে। মা, বাবাকে কাছে পাওয়ার মাঝে সন্তান আনন্দিত হয়। মা বাবার অনুপস্থিতিতে দুঃখিত হয়। দৈহিক বা মানসিক অসাচ্ছন্দে সন্তানরা মা বাবার সাহায্য সহযোগিতা কামনা করে থাকে। মা বাবার অফুরন্ত ভালোবাসায় সন্তান কাজে উদ্যম পেয়ে থাকে। পিতামাতার অপত্য স্নেহ ও কল্যাণশক্তি সন্তানকে রক্ষার জন্য নিয়োজিত থাকে। কিন্তু সন্তান সব সময় তা উপলব্ধি করতে পারে না।একমাত্র বিপদের সময়টুকুতেই তারা এ সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারে।

সন্তান আশা করে থাকে পিতামাতা সব সময়ই তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। মা বাবার প্রতি কর্তব্য বোধ, কিংবা মা বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ। প্রভৃতি সন্তানদের নিকট থেকে খুব কমই প্রকাশ পেয়ে থাকে। বটবৃক্ষের ছায়া যেমন মা বাবার স্নেহও তেমনি স্বাভাবিকভাবে বর্ষিত হয়। মা বাবার কর্তব্য হলো সন্তান সন্ততির মঙ্গলের জন্য তাদের আত্মবিশ্বাস বর্ধিত করা। সেইসাথে বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিজকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হলো মানুষ। মানুষের শৈশব সবচাইতে দীর্ঘ। আর তাই মানবশিশুর সাবলম্বী হতে প্রয়োজন দীর্ঘ সময়ের। এবং সে সময়টুকুতে শিশুকে স্বাধীনভাবে বিকাশের সুযোগ দিলে সে নিজেই চারদিকে যা কিছু তার বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক তা সে বেছে নেবে। শিশুর প্রতি ভালোবাসা এবং স্নেহ হবে প্রবল। কিন্তু আদর হবে সীমিত। সন্তানের মঙ্গলের জন্য অত্যধিক কঠোর কিংবা সংযমী হওয়া যাবে না। একজন শিশু যখন পৃথিবীতে আগমন করে। তখন এ পৃথিবী তার কাছে অচেনা। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এবং আচরণে শিশুটি সতৃষ্ণ লব্ধ জ্ঞান অর্জন করতে শেখে। এ পৃথিবীতে কোন মানুষই আত্মপ্রেমী ও স্বার্থপর হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু অতিরিক্ত বিলাস তাদেরকে স্বার্থপর করে গড়ে তোলে। প্রতিটি মানুষই ভালোবাসা চায়। যুক্তিসঙ্গত ভালোবাসা মানুষকে মহীয়ান করে। অধিকাংশ মা বাবাই মনে করে থাকেন সন্তানের ভবিষ্যত বংশগতি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। অনেকেই এমন ভেবে থাকেন শিশুর বিকাশ আপনা আপনিই ঘটে থাকে। কিংবা একজন মানব শিশুর নৈতিকতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এগুলো বংশগত। এ ভাবনা সত্য নয়। শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষা করলেই তার নৈতিকতা *আপনা আপনি গড়ে ওঠে না। সততা, শ্রমশীলতা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এসকল* গুণাবলী নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। এগুলো সুশিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা চাই। আমরা সচরাচর শুনতে পাই ভালো মা, বাবার সন্তানরাও ভালো হয় । এর অর্থ হচ্ছে পরিবারের নৈতিক পরিবেশ। যে পরিবারে সামাজিক ও নৈতিকতার

উচ্চ মূল্যবোধ বিরাজ করে সে পরিবারের সন্তানরাও তদ্রুপভাবে গড়ে ওঠে। শিক্ষা দীক্ষা এবং লালন পালনের ওপর মানুষের নৈপুন্য গড়ে ওঠে। জন্মেই কোন মানুষ প্রতিভাবান কিংবা নিপুনভাবে গড়ে উঠতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি অপটুভাবে গড়ে ওঠে। তবে বুঝতে হবে তাকে ঠিকভাবে শিক্ষা দান করা হয়নি। কিছু বিরল ব্যক্তি ব্যতিরেকে প্রতিটি মানুষই কোন না কোন ক্ষেত্রে নৈপুন্যের অধিকারী। পরিবার হচ্ছে সেই নৈপুন্য আবিষ্কার ও বিকশিত করার ক্ষেত্র। বহুমুখী প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে মানুষ গড়ে ওঠে। মানুষের জীবনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে অনুভূতি ও হৃদয় গড়ে তোলার পাশাপাশি বুদ্ধির উন্মেষ ঘটানো। প্রকৃত মানবিক নৈতিকতা হচ্ছে প্রাণের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এই মানবিক নৈতিকতা গড়ে তোলা প্রকৃতই কঠিনতম কর্তব্য। জন্মেই কেউ ভালো মানুষ হয় না। ভালো মানুষ গড়তে হয় দীর্ঘকাল ধরে। মানব সমাজের বাইরে থেকে মানুষের প্রকৃতিপ্রদত্ত গুণাবলীগুলোর বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। মানব মস্তিকের সম্ভাবনা বিপুল ও অনন্ত। তবে এই সম্ভাবনা বিভিন্নভাবে ব্যহত হয়ে পড়তে পারে। শিশু যদি মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। তবে সে শিক্ষাদীক্ষার জন্য মানবীয় পরিবেশের নিকট ঋনী। শিশুকে জোর পূর্বক স্নেহ ভালোবাসা শেখানো যায় না। যে ব্যক্তির আত্মিক জগত রিক্ত। সে সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি হয় খুবই নিঃস্ব। ছেলেমেয়েদেরকে আত্মিক বধিরতা থেকে রক্ষা করা। জীবনের সৌন্দর্যকে বুঝতে সহায়তা করা মা, বাবার প্রধান কর্তব্য।

ভালো আচার আচরণ, শিষ্টাচারের নিয়ম পালন, ভদ্রতা এসব স্রেফ বাহ্যিক ব্যাপার নয়। স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষ এসবের মূল্য দিয়ে আসছে। এসবের মাঝেই লুকিয়ে আছে গভীর আধ্যাত্মিকতা এবং সমৃদ্ধ অন্তর্জগত। আপাত মানুষের বাহ্যিক চেহারা, আদবকায়দা, আচরণের শৈলী অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে পান্ডিত্য, বুদ্ধি, রুচি, কর্ম, গুণ ইত্যাদির যাচাই হয়। অর্থাৎ প্রথম অনুমোদিত হয় চোখ। পরে হৃদয়। মূলত প্রকৃত মানসিক গুণাবলী আমরা বিচার করে থাকি আদবকায়দা থেকে। মানুষ তার নিখুঁত আদব কায়দা দ্বারা নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা, নির্লজ্জতা গোপন করতে পারে। কোন মানুষ যখন বুদ্ধিমান, সৎ ও পরিশ্রমী হয়ে থাকে কিন্তু তার আচরণ যদি ভদ্রজনিত না হয় তবে তার এই পরিশ্রম বৃথা। মানুষের আত্মিক সংস্কৃতি তার বাহ্যিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। অথচ আচরণের সংস্কৃতি না থাকলে মানুষের অনেকগুলো গুণ, তার চারিপাশের লোকজনদের জন্য বাস্তব ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মূল্য হারিয়ে ফেলে। মেলামেশার প্রকৃত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। মেলামেশার প্রকৃত সংস্কৃতির মূলে রয়েছে মানুষের সাথে মানুষের মানবিক সম্পর্ক। সমস্ত দেশ, কালভেদে মেলামেশার অভিজ্ঞতা রক্ষা ও সঞ্চয় করা হয়েছে সুন্দরভাবে।

মানুষের প্রতি উদার মনোভাবের অভিব্যক্তি প্রতিটি মানুষের মাঝেই থাকা চাই। মানুষের সাথে মানুষের মেলামেশার আকার বা রূপ হচ্ছে শিষ্টতা। এই শিষ্টতা শিখতে হলে চাই সৌজন্যের রীতিনীতি শিক্ষা করা। নির্দিষ্ট সমাজে অভিবাদন, পরস্পরের প্রতি সম্বোধন, কিছু সহায়তা দানের রীতি। সর্বোপরি, মানুষের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। এবং সেই সাথে ক্ষমা প্রার্থনার রীতিনীতি অর্জন। সন্তানদের কাছে সৌজন্যের যে আভ্যন্তরীন তাৎপর্য তা ব্যাখ্যা করা খুবই প্রয়োজন। কারণ সৌজন্যের দ্বারাই নির্ধারিত হয় পরিচিতির রীতি। খেয়াল রাখা উচিত কোন শিশু যেন একে জটিলভাবে গ্রহণ না করে। এজন্য শিশুদের মাঝে খোলাখুলি আস্থাপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলা চাই। চারিপাশের লোকজন পরিচিত ও অপরিচিত, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী এবং বন্ধু বান্ধব সকলের প্রতি সুন্দর আচরণ গড়ে তুলতে হবে। সৌজন্যের রীতিনীতি পালনের অর্থ প্রচলিত ঐতিহ্য ও রেওয়াজের প্রতিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। পরিবারের লোকদের কাছ থেকেই শিশুরা আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ লোকদের সাথে আচার আচরণ করতে শেখে। উৎসবে অভিনন্দন জানাতে হলে উপহার দেয়া, দুঃসময়ে সহানুভূতি আর সমবেদনা প্রকাশ করা, রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, অপিস-আদালতে, হোস্টেল-রেস্তোরায় আচরণের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। সহানুভূতি, অনুরাগ, আনুগত্য, স্বার্থত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা এগুলো কোন তৈরি গুণাবলী নয়। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট থেকে এ সকল গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা আমরা করে থাকি। ছোটবেলা আবেগ খুব বেশী স্পষ্ট থাকে না। আবেগের পরিণতি অর্জিত হয় দীর্ঘকাল ধরে।

মা.বাবা অনেক সময় বন্ধুত্বের অভাব পূরন করতে পারেন না। বন্ধুত্ব এমন একটি সম্পর্ক যা শুধুমাত্র একঘেয়েমী থেকেই রক্ষা করে না। বন্ধুত্ব বয়সোচিত ভয় এবং আশঙ্কা থেকে রক্ষা করে। শিশুরা বন্ধুত্ব স্থাপনের চাহিদা, বিশ্বাস রাখার চাহিদা, বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কে বিশ্বস্ত হওয়ার চাহিদা প্রভৃতির অনুভব করে থাকে।

কিন্তু এই বয়সের আবেগ ভঙ্গুর ও দুর্বল। ছোট ছেলেমেয়েরা বন্ধুদের বাড়িতে যেতে পছন্দ করে। বন্ধুদের চলাফেরা খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির প্রতি তাদের প্রবল আকর্ষণ। বন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি, ভালো-খারাপ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিচার করার ক্ষমতা তাদের হয়তো নেই। কিন্তু বন্ধুর সহানুভূতি ও বিরাগের অনুভূতি বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের নিকট থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। মা, বাবা সবসময় তার সন্তানদের ইচ্ছাপূরণে সক্ষম নন। আর তাই ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক মেলামেশা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। সন্তান যাতে নতুন সম্পর্কের স্বাদ বোঝে এবং অনুভব করতে পারে। মা, বাবার সেটুকু অনুধাবন করতে হবে।

পারিবারিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আচরণের সংস্কৃতি গড়ার হাজারো রকমের পদ্ধতি ও উপায় রয়েছে। অজস্র উপদেশ, গালাগাল, মন্তব্য, শাস্তি, হুমকি এসব

সন্তানের আচরণের সংস্কৃতি গড়ার অফলপ্রসূ উপায়। এ ধরনের আচরণ সন্তানদেরকে আদবকায়দার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলে।

মানুষের বাহ্যিক চেহারা কিছু মাত্র তুচ্ছ ব্যাপার নয়। কিন্তু এই বাহ্যিক চেহারার মূল্যায়ন আচরণের দোষত্রুটির কারনে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। যেমন— চেঁচিয়ে কথা বলার প্রবণতা, পোশাক পরিচ্ছদে রুচিহীনতা, হাঁটাচলায় বিকৃতি, সব সময় সাজগোজ করা ইত্যাদি মানুষের আচরণকে অসুন্দর করে তোলে।

বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিশেষ তাৎপর্য বহন করে মানুষের অঙ্গভঙ্গি, ইঙ্গিত। যা মানুষের সংযমের সূচক। যেমন— অমার্জিত ব্যক্তির পাণ্ডিত্য পাণ্ডিত্যাভিমানে পরিণত হয়। শিশুর জীবনে বৃহৎ ভূমিকা পালন করে বড়দের প্রভাব প্রতিপত্তি। শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি মতামত গঠনে, স্বনির্ভর চিন্তাধারা বিকাশে, আচার আচরণ নির্ধারনে, পারিবারিক সহায়তা প্রয়োজন।

মানুষের আত্মিক বিকাশে পরিবার যে বিপুল ভূমিকা পালন করে তা অনস্বীকার্য। এমনও দেখা যায়। মা, বাবার ভালোবাসা পরিণত হয় সন্তানের আবদার পূরনের কিংবা স্বার্থপর ইচ্ছা পূরণের বস্তুতে। যে সব মা, বাবার শৈশব কষ্টে কেটেছে তারা তাদের সন্তানদের বহু অন্যায় আবদার রক্ষা করেন। পরিবার হচ্ছে মানুষের আত্মিক বিকাশের উপযুক্ত স্থান। পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে বৈচিত্রতা।পারস্পরিক সুন্দর সম্পর্ক শিশুদের মাঝে সুন্দর আবেগ গড়ে তোলে। আবেগ আমাদের স্বভাবের সমস্ত দিক জুড়ে রয়েছে।

মানুষের এই আবেগ সর্বদাই আমাদের চিন্তাধারাকে, আমাদের ক্রিয়াকলাপকে, আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। অনেক সময় মানুষের কাজের পেশা এবং মানসিক গঠনের মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। অন্যকে এবং নিজেকে বোঝার অক্ষমতার জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, ক্ষমা ও ভালোবাসা প্রদর্শন পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর করে গড়ে তোলে। "ভালোবাসাতে পারা চাই।" এটুকু ক্ষমতা কেউ প্রকৃতিগত ভাবে অর্জন করে না। এটুকু অর্জন করে নিতে হয়। যৌবনে যে আত্মচেতনা গড়ে ওঠে তা ব্যক্তিত্বের স্থায়ী গুণসমূহের একটি। মানুষ হচ্ছে আমাদের শিক্ষাদীক্ষার ফল। কেবল শিক্ষাদানকারীরাই মানুষ গড়েন না। মানুষের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দ্রষ্টা মানুষ নিজেই। শিশুর জন্য তথ্য, প্রভাব এবং আবেগগত সমর্থন লাভের প্রধান উৎস মা, বাবা এবং অন্যান্য গুরুজনেরা। শিশু ধীরে ধীরে বড়দের উপর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক পুর্নগঠিত করে তোলে। মা, বাবার ভালোবাসা সন্তানকে উদার স্নেহশীল এবং অমায়িকভাবে গড়ে তোলে। এই ভালোবাসা শিশুর মধ্য মমতা এবং মহত্ব গড়ে তোলে।

কৈশোরের ভালোবাসা

একজন মানব শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের এবং সংহতিকালের শেষ ধাপ হলো কৈশোর। কৈশোরের গতিবেগ প্রবল। আর এই প্রবল গতিবেগকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ভবিষ্যতের পথ উজ্জ্বল হয়। কৈশোর কালে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশধারা খুব দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে এবং পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। এবং এর মাঝে ব্যক্তিগত পার্থক্য এত বেশী থাকে যে, একে সীমারেখা দ্বারা পৃথক করা যায় না। একজন শিশু কৈশোরের শেষ ধাপে পরিণত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। এই সময় মা-বাবার যথাযথ যত্ন পরিচালনা ও ভালোবাসার প্রয়োজন। এই সময় শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের অভাব কৈশোরে অনুপ্রবেশ ঘটানো বিলম্ব করে। এর ফলে শিশু মানসিক ভাবে পূর্বের কোন এক অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকে। কিংবা তার অগ্রগমন হয় না। এভাবে ধীরে ধীরে একজন মানব শিশু গ্রহণ ক্ষমতা, শেখার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ববোধ, বাস্তববোধ ইত্যাদি অপরিহার্য গুণগুলোর বিকাশ ঘটাতে পারে না। কৈশোরে একজন মানব সঠিক পরিচালনার অভাবে নিজের সম্পর্কে সুউচ্চ ধারণা পোষণ করে। আকাংখা থাকে প্রচুর। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌছানো অসম্ভব হলে কিশোর-কিশোরীর মনে দেখা দেয় হতাশা। হীনমন্যতা অথবা অধিক উত্তেজনা। আবার অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবার অতি উচ্চ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলেও কিশোর-কিশোরীর মনে চাপ সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে সমাজের প্রতিও এদের চরম আক্রোশ সৃষ্টি হয়। কৈশোরের মানসিকতা দ্বন্দ্ব ও সমস্যায় পরিপূর্ণ থাকে। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা নানাদিক থেকে অপরিপূর্ণ থাকে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা পরিবার ও বৃহত্তর সমাজের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে অনেকটা অপারগ থাকে। পারিবারিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে বেগ পেতে হয়। তাই এ বয়সের ছেলেমেয়েদের মাঝে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা যায়। পরিবারের লোকদের ব্যবহারে অসংগতি ছেলেমেয়েদেরকে আরও সমস্যায় জর্জরিত করে দেয়। কৈশোরের শারীরিক বিকাশের সাথে সাথে মানসিক বিকাশও সমান তালে চলে। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা খুব আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। আবেগের প্রকাশ তীব্রভাবে দেখা দেয়।

এরা আবেগ দ্বারাই চালিত হয়। এদের মাঝে ঘৃণা, উৎসাহ ও হতাশার প্রকাশ পাশাপাশি চলে। এই বয়সে দ্রুত আবেগের পরিবর্তন, অস্থিরতা, ক্লান্তিবোধ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এ সময় এরা মাতা, পিতা, শিক্ষক কিংবা কোন বিখ্যাত মানুষের মাঝে আদর্শকে খুঁজে ফেরে। এদের মাঝে একাত্মতা, অনুভব, সমাজ সচেতনতা, নীতিবোধ ইত্যাদির তীব্রতা দেখা যায়।

আমাদের এই সমাজে একজন কিশোরী মেয়ের জন্য নাজুক ও বিপন্ন কাল হলো তার কৈশোর কাল। হঠাৎ করেই পুতুল খেলার বয়সটি মেয়েটির হারিয়ে যায়। যুবতী মেয়েরা থাকে উচ্ছল প্রাণবন্ত। কিশোরী মেয়েরা তেমনটি হতে পারে না। কোন এক আড়ষ্টভাব তাদের মাঝে প্রকাশ পায়। একজন কিশোরী কৈশোর কালে পদার্পণ করার পর থেকেই পরিবারের প্রতিটি সদস্য তাকে শৃঙ্খলিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। শিশু কালের আদর ভালোবাসার স্থানে গড়ে ওঠে শাসনের পৃথিবী। এভাবে নিজ অস্তিত্ব থেকে ধীরে ধীরে সে দূরে সরে যেতে থাকে। তার চারপাশে গড়ে ওঠে বিভ্রান্তির জগত। একজন কিশোরীর দেহগত পরিবর্তন তার মনোজগতেও প্রভাব বিস্তার করে। কিশোরীর ঋতুবতী হয়ে ওঠা তাকে আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন করে তোলে। এ সমাজের একগাদা নিষেধের বেড়াজালে কিশোরীকে আবদ্ধ করা হয়। কড়া শাসনের বেড়ি পরানো হয় কিশোরীর কোমল পায়ে। আবার বড়দের কথায় অংশগ্রহণ করলে তাকে পাকামো ভাবা হয়। অর্থাৎ আচরণে হবে শিশুর মতো, চলনে-বলনে পরিণত নারী। সমাজের সব পুরুষ সম্পর্কে ভীতিকর একটা মনোভাব ঢুকিয়ে দেয়া হয় কিশোরীর মনে। একজন আধুনিক মা-ই পারেন একজন কিশোরীকে প্রয়োজনীয় সন্তান হিসাবে গড়ে তুলতে। নিজেকে পরিপূর্ণ মূল্যবান করে একজন ছেলের সমপর্যায়ের করে গড়ে তুলতে মা-বাবার সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে। কিশোর-কিশোরীর যৌন সমস্যাও এই বয়সের আরেকটি সমস্যা। কিশোর-কিশোরীর যৌন জ্ঞান তাদেরকে অনেক সমস্যা থেকে রক্ষা করে রাখে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে সহজ সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে। মানুষের মাঝে সহমর্মিতার ভাব কমে গেছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা বোধ জেগে ওঠে। কৈশোরের একটি বৈশিষ্ট্য আদর্শবাদিতা। রাজনীতি ও প্রশাসনে ঢুকে গেছে অনিয়ম। সৎ মানুষের সমাজে কোন স্থান নেই। আর তাই ছেলেমেয়েদের মধ্যে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে দেখা দেয় দ্বন্দ্বপূর্ণ মানসিকতা। মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে হিংসা। এই পরিবেশে কিশোর-কিশোরী মনের প্রশ্নগুলিকে অবদমিত করে কলুষতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। কেউ বা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। কেউ আবার অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। সমগ্র পৃথিবীতে এভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। এ ধরনের ছেলেমেয়েরা মা-বাবা কিংবা নিজেদের

আশা-আকাংখা পূরণে ব্যর্থ হয়ে বিপথগামী হয়ে পড়ে। প্রগতিশীল পৃথিবীতে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে না পেরে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হীনমন্যতায় ভোগে।

জনসংখ্যার বাড়তি চাপ এবং ঈর্ষাভিত্তিক প্রতিযোগিতা সামাজিক সংকট বাড়িয়ে তুলেছে। অল্প পরিসরে অধিক লোকের বাস মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এছাড়াও টি. ভি সিনেমা এ দুটির অপব্যবহার সমাজের অপরিসীম ক্ষতি করে ফেলে। যেমন মারামারি, উগ্র যৌনতা ইত্যাদি কিশোর-কিশোরীদের জন্য ক্ষতিকর। যে কোন উদ্দীপক বিষয়বস্তু কৈশোর মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। এজন্য ছেলেমেয়েদেরকে এ বয়সে যুক্তিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

কিশোর-কিশোরীকে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে অভ্যস্থ করে তুলতে চাইলে এদের মাঝে যুক্তিভিত্তিক জীবন দর্শন গড়ে তুলতে হবে। শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক প্রীতিকর অভিজ্ঞতার উপরই শিশু জীবন দর্শন খুঁজে পায়। নীতিকথা বলে মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করা যায় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাই জীবনের পথ প্রদর্শক। কথার চাইতে উদাহরণ মানুষের মনে প্রভাবশালী। মা, বাবা, পরিবার পরিজন, শিক্ষক শিক্ষিকা ছাড়াও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ভালোবাসা কৈশোরের জীবনদর্শনের সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। শৈশব কালের অপ্রীতিকর ঘটনা কৈশোরে প্রভাব বিস্তার করে। সুস্থ্য জীবন দর্শন কিশোর জীবনে বিপথগামীতা থেকে রক্ষা করে রাখে। কৈশোরে ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য শৈশবকাল থেকেই সচেষ্ট থাকতে হবে। কোন একদিন হঠাৎ করে কিশোরদের পরিবর্তন করতে চাইলেই করা যায় না। যে সব শিশুরা ছোটবেলা থেকে ঘৃণা ও গভীর প্রত্যাখ্যানের মাঝে বড় হয় এরা ভালোবাসতে শেখে না। বরং ভালোবাসার পরিস্থিতিকে ভয়ও সন্দেহ করে থাকে। পরবর্তীতে ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশে বাস করলেও ব্যবহারে সন্দেহ ও হিংসার প্রকাশ থেকেই যায়। কৈশোরে সুন্দর জীবন যাপনের জন্য পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৈশোর জীবনে কোন অস্বাভাবিকতার ইঙ্গিত পেলে মা, বাবা, শিক্ষক, শিক্ষিকা, সমাজকর্মী, চিকিৎসক সকলেরই সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।

আশা ভালোবাসা

আমাদের প্রতিটি মানুষের জীবনে ভালোবাসা একটি মধুর অনুরনন। মধুর সুখানুভূতি। "ভালোবাসা" পৃথিবীর কোটি মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত বাণী। পৃথিবীর প্রতিটি মানবকুলের মনে ভালোবাসার অনুভূতি জীবনের কখনও বা কখনও দোলা দিয়ে যায়।

ব্যক্তিজীবনে ভালোবাসা থেকেই জন্ম নেয় আনন্দ বেদনা। প্রতিটি মানুষই তার স্বজনদের ভালোবাসে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই রঙ অতি দ্রুত বদলায় যা হারিয়ে যাবার ভয়ে আমরা কেঁপে উঠি। তারপরেও ধীরে ধীরে মানুষ তা থেকে সরে আসতে পারে।

ভালোবাসার নেই কোন সীমা পরিসীমা। ভালোবাসা স্থান, কাল, পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। খুব ভালোবাসার কোন কিছুর ওপর থেকে হয়তো বা টান হারিয়ে যায় ধীরে ধীরে। নতুন আরো বহু কিছুকে ভালোবাসতে শেখে মানুষ। এভাবে মানুষ এগিয়ে চলে ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা নিয়ে।

ভালোবাসার অনুশীলনের মাঝেই মানুষ বেঁচে থাকে। অনাবিল কৌতূহল থেকে ভালোবাসার যে জন্ম তাই নিজ ভূবনকে পূর্ণ করতে সহায়তা করে। ভালোবাসার অনুশীলন যার মাঝে হয়নি সে পারে না ভালোবাসতে। যার মধ্যে নেই কোন কৌতূহল। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে যে আনন্দ খুঁজতে জানে না, সে-ই তো জটিল মানুষ। জটিল মানুষ কোন বিষয়ে আনন্দ লাভ করতে জানে না। একজন অত্যাচারী পিতা কিংবা মমতাহীন স্বামী পারে না কাউকে ভালোবাসতে। প্রকৃতি ও শিল্পকলাকে যে ভালোবাসতে জানে, সে মানুষ অপরকে ভালোবাসতে জানে। অপরকে ভালোবাসতে চাইলে সর্বপ্রথম নিজেকে ভালোবাসতে জানতে হবে। নিজেকে উপলব্ধি করতে পারলে অপরকে উপলব্ধি করা যায়।

নিজেকে ভালোবাসতে চাইলে প্রথমেই নিজের সম্বন্ধে সব দুর্বলতা ও হীনতা ত্যাগ করতে হবে। যা কিছু আমাদের পায়ে শেকল পরায় তা পরিত্যাগ করে নিজকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। অপরের হাতের পুতুলে পরিণত হলে চলবে না। নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যেতে হবে। পরের জন্য

ভূতের বেগার খেটে মূল্যবান সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। নিজেকে ভালোবাসতে চাইলে নিজের জীবনের স্বপ্ন ও ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দেয়া চাই। যে কোন সুন্দর কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। সর্বদা অন্যের মর্জি মাফিক চলতে হবে তা ঠিক নয়। তবে কোন বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো। সর্বক্ষেত্রে সব কাজের সফলতা আশা করা বৃথা। কোন কাজে ব্যর্থ হলে ভুল থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত।

চারপাশের জগত সম্পর্কে চোখ কান খোলা রাখা উচিত। সবজান্তার পরিচয় না দিয়ে অপরের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করা যায়। মনে কোন প্রশ্ন জাগলে উপযুক্ত লোক থেকে জেনে নেয়া যায়। মনের দিগন্ত প্রসারিত করতে চাইলে সব সময় নতুন তথ্য জানার এবং শেখার চেষ্টা করা ভালো।

সব রকমের পরিস্থিতি এবং কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা উচিত। জীবনটাকে গুছিয়ে চলার অভ্যাস রপ্ত করা ভালো। ধীরে ধীরে তা স্বভাবের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।

যে কোন কাজে চটপটে কর্মঠ ও সচেতন হওয়া ভালো। নিজের মাঝে যত বেশী প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর থাকবে ততই কাজের উদ্যম বাড়বে। অতি সহজে ক্লান্ত, হতাশ ও মুষড়ে পড়া ঠিক নয়। দৈনন্দিন কাজ থেকে যত বেশী আনন্দ লাভ করা যায় ততই ভালো। নিজের পারিপার্শ্বিকতাকে ভালো লাগার জন্য মুগ্ধতাকে বাড়াতে হবে। যে কোন কাজে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নেয়া ভালো। প্রয়োজনে বিজ্ঞ লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে যুক্তি সঙ্গত ঝুঁকি নেয়া যায়। বিপজ্জনক ঝুঁকি হলে সিদ্ধান্ত না নেয়াই ভালো।

শক্তি ও সামর্থ্য যতদিন থাকবে ততদিন পরিশ্রম করে নেয়া ভালো। তবে শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করাই ভালো। যে কাজ অন্যকে দিয়ে ভালোভাবে করানো যায় তা করিয়ে নিলে নিজের শক্তি সামর্থ্যের অপচয় কম হয়।

পূর্ব সংস্কার কাটিয়ে উঠতে চাইলে উদার ও নমনীয় হয়াই ভালো। কোন কাজ শুরু করার পূর্বে কাজটির ভালো ও মন্দ দুটো দিক বিবেচনা করেই কাজে অগ্রসর হওয়া উত্তম। নিজকে পরিবর্তন করতে চাইলে আচার আচরণে সংযত হওয়াই উত্তম।

আমাদের আশপাশের লোকজন যে যেমন তাকে যদি ঠিক তেমনভাবেই আমর গ্রহণ করে নিতে পারি তবে মানসিক ভাবে আমরা শান্তি পাব। প্রতিটি মানুষের মাঝেই দোষ গুণ রয়েছে এটুকু ভেবে নিয়ে অপরকে ক্ষমা করে দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সেই সাথে নিজকে ক্ষমা করতে হবে।

অপরকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া উচিত। বিনিময়ে অপরেও যাতে আমাদেরকে সম্মান করতে শেখে এটুকু অপরকে পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। যে মানুষ

মানুষের সাথে ব্যবহারে নমনীয় নন তার সঙ্গ এড়িয়ে চলা ভালো।

যারা আশাবাদী লোক তাদের সঙ্গে থাকা উত্তম। যে কোন বিষয় শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চলবে না। অপরের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার বিষয়টি বিবেচনা করা উত্তম।

যে কোন প্রতিযোগিতায় সুস্থভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত। সব প্রতিযোগিতায় জিতবই এমনটি ভাবা ঠিক নয়। হারজিৎ যাই ঘটুক না তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোন কাজে হাত দেবার পূর্বেই ভবিষ্যত ভেবে উৎকণ্ঠিত হওয়া ঠিক নয়। তবে বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। অকারণ উৎকণ্ঠা জীবনের আনন্দকে মাটি করে দেয়। উৎকণ্ঠাকে জয় করার শক্তি থাকা চাই।

অতীতের কোন ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় সর্বদা আতংকিত না থেকে ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যত স্বপ্ন সফল তখনই সম্ভব মানুষ যখন সত্যিকার অর্থে নিজেকে ভালোবাসতে পারবে। যে ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়বে ব্যক্তিজীবনের চারদিগন্তে। ভালোবাসায় রয়েছে বিপুল বিস্তার। যে ভালোবাসা ব্যক্তি জীবন উন্নয়নে সহায়ক সে ভালোবাসা একসময় ছড়িয়ে পড়ে সমাজ, সাহিত্য, রাষ্ট্রিক এবং ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে। ভালোবাসার সুখ-দুঃখ আমাদেরকে বয়ে নিয়ে যায় এক বিশাল ক্ষেত্রে। যে ক্ষেত্রে আমরা বিচরণ করি এক থেকে অপরে নতুন থেকে নতুনত্বে। ভালোবাসার যাত্রা অবিরাম অবিশ্রান্ত।

ভালোবাসার নারী

স্বপ্ন ও বাস্তবের মিশ্র অনুভূতি নিয়েই মানুষের ভালোবাসা। পৃথিবীতে মানুষ দুঃখ ব্যাথা হতাশা ব্যর্থতা নিয়ে নিঃসঙ্গতার শিকার বলেই তার জন্য প্রয়োজন স্বাপ্নিক ভুবন। এই ভুবনে মানুষ গড়ে তোলে এমন এক প্রেম যার মৃত্যু নেই। প্রেমের আকর্ষণে জন্ম নেয় আবহমান ভালোবাসা।

যে নারীকে কখনও ভোলা যায় না। তেমনি হারিয়েও হারানো চলে না। ভালোবাসার প্রতিরূপ যদি কোন নারীর মাঝে পাওয়া যায়। কিন্তু তাকে একান্তভাবে পাওয়া যায় না। তখনই সে "ভালোবাসার নারী"কে ধরে রাখতে চায় সকলে। আপন দাম্পত্য জীবনের যন্ত্রণাদায়ক অতৃপ্ততায় সে নারীকে আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরে।

মানুষ বৃক্ষ নয়। সচেতন বলেই মানুষের জীবন যন্ত্রণা হাজারো। যে নারী একা থাকতে ভালোবাসে। তাঁর কোন দুঃখ নেই। যদিও কারো জন্য অবচেতনে প্রতীক্ষা তার রয়েই যায়। নারীর জীবন এক এডভেঞ্চার। যেখানে সর্বদাই সাহসের প্রয়োজন। মেয়ে হয়ে জন্মালে অনেক কিছু নিয়েই মাথা ঘামাতে হয়। সুন্দর মসৃণ শরীরে বুদ্ধি বৃত্তিরও যে স্থান আছে তা আত্মপ্রকাশের জন্য সংগ্রাম করে। মা হওয়া যে একটি অধিকার এ সত্যটুকু সবাইকে বোঝানো। পদে পদে নারীকে পরাজিত হতে হয়। লাঞ্ছিত হতে হয়। কিন্তু এতে হতাশ হলে চলবে না। বিজয়ের চাইতে বিজয়ের সংগ্রাম বড়। গন্তব্য পৌছানোর চাইতে যাত্রা পথ অনেক সুন্দর।

ছেলে হয়ে জন্মানোর মাঝে দুঃখ কম। রাস্তায় ধর্ষিতা হবার ভয় থাকে না। প্রয়োজন হয় না বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তে মসৃণ শরীর বানানোর। ছেলে হয়ে জন্মালে জীবন সংগ্রাম অনেক সহজতর হয়। কিন্তু ছেলে হয়ে জন্মালেই যে সব ধরনের দাসত্ব আর অবিচার থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে এমনটি নয়। যার মাংশপেশী যত সবল তার বোঝাও তত ভারী। তাই পুরুষের জীবন সহজ নয়। হৃদয় এবং মস্তিষ্কে কোন নারী পুরুষে ভিন্নতা নেই। ব্যবহারেও নয়। মানুষ যদি হৃদয় ও মস্তিষ্ক সম্বলিত একজন ব্যক্তির মতো আচরণ করে তবে কখনোই ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

নারীরা স্বভাবতই ভীতু। এই শব্দটির মতো ঘৃণ্য কোন বিশেষণ নেই। ভীতি মানুষকে মানুষ হতে দেয় না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরে কুরে খায়। একটি প্রজাতির ঐতিহাসিক বিকাশের ফল হলো মানুষ। মানুষ কেবল মাত্র মানব প্রজাতি নয়। সুতরাং প্রজাতির বিচার করতে চাইলে একজন নারী পুরুষের চাইতে কর্মে ও গঠনে অক্ষম অযোগ্য ও খর্ব নয়। মানব সভ্যতার ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করতে যাই তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গুলোতে নারীকে দেখতে পাই। কৃষি আবিষ্কারের যুগে বয়নকার্য, মৃৎকার্য, কৃষিকার্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা দেখতে পাই। মেয়েরা তখন ক্ষেত খামারের কাজ করতো। শষ্য ফলাতো, মাটির পাত্র তৈরি করতো। গৃহ পরিচর্যা, সভ্যতার স্থপতি ইত্যাদি মেয়েরা চালনা করতো। সম্পত্তিতে মাতৃধারাই ছিল প্রধান। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অধিক সন্তানের গর্ভধারীনির ছিল অধিক মর্যাদা। কারণ তখনকার জীবনযাত্রা ছিল প্রতিকূল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং হিংস্র প্রাণীর সাথে মোকাবেলা করে মানুষকে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। আর তাই প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করার জন্য অধিক সন্তান প্রয়োজনীয় ছিল। এক সময় মনে করা হতো যে দেশের মানুষ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যে পিছিয়ে আছে সে দেশের মানুষ কম বুদ্ধি সম্পন্ন। আর যারা এসব ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে তারা উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারী। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের মানুষ অধিক বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু বর্তমানে এ তত্ব কার্যকরী নয়। তেমনি পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিক বুদ্ধির অধিকারী তা আজ আর কার্যকরী নয়।

নারী জাতীর প্রকৃত ইতিহাস খুঁজতে গেলে তা পাওয়া দুষ্কর। নারী ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত যা কিছু আমরা জানতে পারি, তা সবই পুরুষেরই রচিত গ্রন্থ। কিছু কিছু গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য মহিলাদের জীবনী নিয়ে, কিছু নারীদের শিশু পালন, পারিবারিক ও যৌন বিষয়ক গ্রন্থ। আবার কিছু গ্রন্থ আছে নারী জাগরণের উপর। ইতিহাস খুঁজতে গেলে দেখা যায় শিল্পী নারী, কিংবা অভিযাত্রী নারী ইত্যাদি। আনুমানিক ভাবে বলা হয়ে থাকে সুদুর অতীতে স্ত্রী পুরুষে অবাধ মেলামেশা ছিল। স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশার স্তর থেকেই ধীরে ধীরে মানব প্রজাতির যাত্রা শুরু হলো।

যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক নর নারীই তখন পরস্পর মিলিত হতে পারত। ধীরে ধীরে সন্তানের পরিচয় নির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে বিবাহ প্রথা চালু হয়। সেই সময় একই রক্ত সম্পর্কে এবং একই বংশে স্ত্রী পুরুষের মাঝে বিবাহ প্রথা চালু ছিল। বন্য অবস্থায় বিবাহ প্রথায় নানা রীতি চালু ছিল। যেমন— সমস্ত দাদা দাদী কিংবা সমস্ত নানা নানী পরস্পর স্বামী স্ত্রী ছিল। বাবা মা স্তরের সকল নারী পুরুষ এবং ভাই বোন স্তরের সমস্ত নারী পুরুষ স্বামী স্ত্রী ছিল। এরপর ধীরে ধীরে ভাই বোন বিবাহ প্রথা রহিত হলো। এরপর আবার নতুন এক ধরনের বিবাহ প্রথা চালু

হলো। এই বিবাহে সমস্ত ভাই এবং তাদের স্ত্রীরা পরস্পর স্বামী স্ত্রী হতো। সমস্ত বোন এবং তাদের স্বামীরা হতো পরস্পর স্বামী স্ত্রী। স্বামীদের মধ্যে যে কোন একজন পুরুষ এবং স্ত্রীদের মধ্যে যে কোন একজন নারী প্রাধান্য পেতেন। এ ধরনের স্বামী স্ত্রীগণ ইচ্ছা করলেই সম্পর্ক ভেঙ্গে নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে পারতেন। এই ধরনের বিবাহ প্রথা পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয়ে একজন পুরুষ কিংবা একজন নারী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমশঃ পুরুষের ক্ষেত্রে একাধিক বিয়ে কার্যকর হলো। একসময় একাধিক বিয়ে প্রথা বন্ধ হয়ে একাধিক রমণীর সাথে যৌন মিলনের জন্য বেশ্যাবৃত্তি প্রচলিত হলো।

বিবাহের পর আসে সম্পত্তির ধারণার রূপান্তর। পূর্বে মানবগোষ্ঠির একটা উপজাতি মিলে একটা অঞ্চলে বাস করতো। সেই উপজাতির সকলেই সে সম্পত্তি সমানভাবে ভোগ করতে পারতো। অন্য কেউ সেই সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে পারতো না। সেই সময় প্রাচুর্যের কোন অভাব ছিল না বিধায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রয়োজন ছিল না। প্রাচীন যুগে ঘরবাড়ী, বস্ত্র, পশু, বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র ছিল সকলেই সম্পত্তি। ক্রমে ক্রমে পুরুষরা শিকারের কাজে বাইরে বের হতো। আর মেয়েরা ফল মূল খাদ্যশষ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করতো।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারী প্রাধান্য বিস্তার লাভের কারণ হলো মেয়েরা পশু পালন করতো। তাছাড়া খাদ্যের জন্য পশুর মাংস আগুনে ঝলসে খাওয়ার ব্যবস্থা করতো মেয়েরাই। মেয়েরা এভাবে আগুন থেকে রান্নার প্রচলন বের করে এবং কৃষি কাজও মেয়েরাই করতো। এছাড়াও মাটির জিনিস বানাতো মেয়েরাই। এভাবেই সমাজে নারী কাজের ক্ষেত্রে এগিয়ে গেল। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় নারীর গর্ভের মূল্য ছিল। পুরুষরা শিকার করতো। শিকার ও যুদ্ধ ছিল পুরুষের পেশা। যুদ্ধে যারা হেরে যেত তাদেরকে ক্রীতদাসরূপে বন্দী করে এনে তাদের উপর অত্যাচার করা হতো। এভাবে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার থেকেই পুরুষরা নারীদেরকে বিভিন্ন নিপীড়ন মূলক আচরণ শুরু করে। ধীরে ধীরে নারীরা বিভিন্ন বেড়া নিষেধের জালে বন্দী হলো। নারীদের উপর অর্পিত হতে লাগলো নানা সামাজিক রীতিনীতি। পারিবারিক জীবনে নারী ও শিশু শোষিত হতে লাগল সর্ব পর্যায়ে।

মানুষ মাত্রেই সৌন্দর্যের পূজারী। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। আর তা যদি হয় রমনীরও তবে তো আর কথাই নেই। সাজসজ্জায় মানব মনের রুচি ফুটে উঠে। প্রতিটি মানুষই চায় তাকে অন্যের চোখে ফুটিয়ে তুলতে। একজন নারীর ক্ষেত্রে রূপচর্চা পুরুষের চাইতেও অধিক প্রয়োজন। নারীকে তো রূপচর্চা করতেই হবে। কারণ যুগ যুগ ধরে অর্থাৎ গ্রীক, রোম, মোঘল যুগ পেরিয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার

গন্ডী পেরিয়ে বর্তমান শিল্প সাহিত্যের যুগেও নারী রূপচর্চার ক্ষেত্রে কোন অংশে পিছিয়ে নেই।

সাহিত্য, শিল্পকর্ম, ধর্ম ইত্যাদি গ্রন্থ যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তবে কোথাও নারীদের কোন অবস্থান আমরা দেখতে পাই না। একজন নারী যদি তার উপযুক্ত রূপচর্চা, রন্ধনচর্চা, সেলাই চর্চা ইত্যাদিতে পারদর্শী না হয় তবে সে নারীকে কেউ নারী বলে গণ্য করতে পারে না। একজন নারীর রূপবতী হয়ে জন্মগ্রহণ করার মধ্যেই নারী জীবনের সার্থকতা নিহিত আছে। কিন্তু নারীর সামাজিক রূপ তার জীবনের সার্থকতা আনয়ন করে না।

নারীর রূপ হবে স্নিগ্ধ ও লাবনাময়। যে নারী স্বভাবে অত্যন্ত কোমল। যার কণ্ঠস্বর কোকিলের মতো মিষ্টি। যে কম খায়, কম ঘুমায়। ভীরু প্রকৃতির বুদ্ধিমতি ও রূপসী নারী সব পুরুষই কামনা করে। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে বিভিন্ন দেশে নারীকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে চাওয়া হয়। আমাদের দেশে নারী কয়েকটি নামে পরিচিত। যেমন পদ্মীনি, শঙ্খীনি, চিত্রানী, হস্তীনি। পদ্মীনি নারী পরিচিতির দিক থেকে সবচাইতে উপরে আছে। এই জাতীয় নারীর গায়ের রং হবে গৌরবর্ণ। চোখ হবে টানা টানা, ভ্রুযুগল জোড়া, উন্নত ললাট, খাড়া নাক, উচ্চতা মাঝারী ও লম্বা চুল। এসব নারীরা অত্যন্ত লক্ষী ও পয়মন্ত হয়ে থাকে। অপর দিকে হস্তীনি নারীদের গায়ের রঙ কালো, শরীর লোমশ, হাত পায়ের গঠন মোটা এবং গলার স্বর কর্কশ। এরা খুব বেশী কলহপ্রবণ হয়ে থাকে। এই হলো মোটামুটি আমাদের দেশের নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য।

এভাবে পুরুষ যুগে যুগে নারীর রূপকে সর্বপ্রথম গুণ হিসাবে চিহ্নিত করে আসছে এমনকি শিল্প, সাহিত্যে ও স্থাপত্যেও পুরুষ নারীকে নিজের মনের মতো করে সৃষ্টি করেছে। কামনার দেবী ভেনাসের নগ্নমূর্তি বহু শিল্পীর ভাবনায় স্থান পেয়েছে। এভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন কামোদ্দীপক নারীমূর্তি পুরুষের শিল্পকলায় স্থান পেয়েছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারীমূর্তি কিংবা নারীর নগ্ন স্তনযুগলের কোন ছবি শিল্পের নামে নারীর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমা পুরুষের যৌন উপাদান হিসেবে স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

শিল্পীর কামোদ্দীপক রূপায়নে শিল্প চিত্রের যতই নৈপূন্যে থাকুক না কেন। এ যে নারীকে ভোগ্যসামগ্রীর উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করারই সামিল। এ ধরনের শিল্পে মানব মনের বিকাশের পরিবর্তে নারীর লাঞ্ছনাটাই প্রবলতর হয়।

দেহগত কারণে নারী পুরুষ থেকে পৃথক। কিন্তু নারীত্ব বলে যে কথাটি শুনে থাকি তা কিন্তু নারীর দেহগত কোন অবস্থান নয়। যে নারীর মাঝে আমরা ব্যক্তিত্ব দেখতে পাই। যার মাঝে নারীসুলভ কমনীয়তা নাই। তাকে আমরা পুরুষালি মেয়ে বলে থাকি। নারী পরিশ্রমের কাজ করলে তার কমনীয়তা নষ্ট হয়ে যায়।

সৌন্দর্যবোধ নারী পুরুষ সকলেরই কাম্য। পোষাক আমাদের এই সৌন্দর্যকে বিকশিত করে। কিন্তু পোশাক যদি যৌন প্রীতি বাড়িয়ে তোলে তবে তা পোশাক না হয়ে হবে যৌন প্রতীকি। পোশাক তো পরিধান করা হয় শুধুমাত্র লজ্জা নিবারণ এবং প্রতিকূল পরিবেশ থেকে শরীরকে রক্ষার জন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেয়েদের পোশাক ছেলেদের পোশাকের চেয়ে ভিন্ন। পুরুষের পোশাকে শালীনাতবোধ আছে। পুরুষ প্যান্ট, শার্ট, কোট পরে শরীরকে ঢেকে রাখে। অথচ অন্যদিকে দেখা যায় নারীর পোশাক থাকে সংক্ষিপ্ত। বুক, পেট, কোমর, পিঠ ইত্যাদি অনাবৃত থাকে। যা পুরুষের যৌন প্রীতিকে বাড়িয়ে তোলে। নিতম্ব দুলিয়ে হাঁটার জন্য হাই হিল জুতো বানানো হয়। তেমনি সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে নারীকে অলংকারে সুসজ্জিত করা হয়। অথচ পোশাক এমন হওয়া উচিত যা শরীরে স্বাচ্ছন্দ আনয়ন করে। কিন্তু নারীর পোশাকে স্বাচ্ছন্দের পরিবর্তে, কামুক পুরুষের আনন্দ বর্ধন করে।

যুগে যুগে অবহেলিত নারী পুরুষের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় এবং দামী করে গড়ে তোলার জন্য নিজকে বিভিন্ন দামী পোশাক এবং অলংকারে সুসজ্জিত করে রেখেছে। যে পোশাক নারীদের কর্মজগতে সাবলীলতা যোগায় নারীরা তা পরিধান করে না। যে পোশাক পুরুষের মন যোগাতে পারে নারীরা সাধারণত সেই পোশাকই পরিধান করে থাকে।

নারী প্রকৃতিকে আত্তীকৃত করে। এই আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে নারীর সাথে প্রকৃতির কোনও ধরনের আধিপত্তের বা সম্পত্তির সম্পর্ক তৈরি হয় না। নারীরা যেমন পৃথিবীর মালিক নয় তেমনি তারা নিজের দেহেরও মালিক নয়। কিন্তু তারা বাড়তে দেয়া ও বেড়ে উঠতে দেয়ার জন্য নিজের দেহের সাথে বাইরের পৃথিবীর সম্পর্ক রাখে।

"কথায় বলে ভালোবাসা জ্ঞানের চাইতে ক্ষমতাশালী।" তবে সেই ক্ষমতা যদি মানসিকতার পক্ষে ব্যয় করা যায়। ভালোবাসা কেবল ব্যক্তিগত বিষয় নয়। কেবল মাত্র ব্যক্তিগত চাহিদায় ভালোবাসাকে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। তাই ভালোবাসার ক্ষমতাতে বিশ্বাস আনা দরকার। কারণ যে কোন একটি শক্তিকে আশ্রয় করে মানুষ বাঁচে। পৃথিবীতে সবচাইতে মূল্যবান হলো মানুষের মুক্তি। ব্যক্তি মানুষের অথবা সমষ্টি মানুষের মানুষকে ভালোবাসার অধিকার। প্রয়োজনেই মানুষ মানুষের সান্নিধ্য কামনা করে।

প্রেম এমনই এক শক্তি যা মনকে দেয় প্রশান্তি অপর দিকে মনের উপর সৃষ্টি করে চাপ। জীবনের কোন কোন সময় প্রেমহীনতার শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হয় মানুষ। চাহিদা তাড়িত হয়ে সম্পর্ক ঘটে মানুষে মানুষে। ক্ষণস্থায়ী ভালোবাসা বা ভালোবাসার মাঝে মানুষ দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের সম্ভাব্যতা খুঁজে বেড়ায়। বিশ্বস্ততার

ক্ষেত্রে খোঁজে একে অপরকে বোঝার ক্ষমতা সহ্যশক্তি এবং ধৈর্য্য। কিন্তু অসহিষ্ণু মানুষ কি কখনও এক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে?

যদিও প্রতিটি মানুষই শুদ্ধ ভালোবাসায় বিশ্বাস করে। অন্যদিকে ভাবালুতায় কখনও গোপন মিলনে অবগাহন করে। ব্যক্তি মানুষ মুক্তির চাহিদায় কোন অযাচিত আচরণের টানাপোড়েনে আবদ্ধ হতে চায় না। নিজেকে সমর্পণ করে দু'দিন পরেই প্রত্যাশায় ভারাক্রান্ত হয়। অন্যত্র ছোটে চাহিদা নিবারণে। তখনই একে অপরের ইচ্ছের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে পড়ে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুরু হয় টানাপোড়েন। যে কোন মানুষেরই একাগ্রতায় আসতে পারে ব্যাঘাত। একে অপরের প্রতি হয়ে পড়ে অসহিষ্ণু। একে অপরের প্রতি হয় তিক্ত। কাজের মধ্য থেকে আনন্দ ও ভালো লাগাগুলো উধাও হয়ে ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে গুটিয়ে পড়ে। জীবন হয়ে পড়ে তিক্ত ও বিষাদ। উভয়ের মাঝে বিরাজ করে দুঃসহ এক নিস্তব্ধতা। জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিটুকু হয় বিষাদে দুর্বল। দীর্ঘ নিস্তব্ধতা চেতনার মূল ধরে নাড়া দেয়। দেশ কাল পাত্র ভেদে লিঙ্গ গত চেতনা হয়ে পড়ে এক ও অভিন্ন। প্রেম ও বন্ধুত্বের মাঝে একটি স্থায়ী সম্পর্ক সকলেই আশা করে। কিন্তু স্থায়ী সম্পর্ক কি আদৌ সম্ভব? একজন মানুষ তার স্বাভাবিক বোধগুলোর নিবৃত্তি খুঁজবেই। কিন্তু সমাজ একজন মেয়েকে তার সুস্থ্য চেতনা অর্জনের সুযোগ দেয় না। যদি তা ঘটতোই তবে প্রেম জনিত ঘটনা নারীকে আত্মধিক্কারে বিপর্যস্ত করতো না। জীবনকে স্বাধীন চেতনায় অনুভব করতে পারলে মানুষ হতে পারে সৃজনশীল। অপরের প্রত্যাশার কাছে নারীকে হতে হয় হৃদয়হীন ভাবে নির্লিপ্ত। এটা নারীকে দারুন ভোগায়। এদেশের মেয়েদের সংস্কৃতি হলো আচরণগত সংযম। কৃচ্ছতাসাধন বাক্‌সংযম। নিজ সংস্কৃতিগত সংযম অমার্জনীয় অপরাধ। নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প হয় আত্মঘাত মূলক। নারী ব্যর্থ হয় তার গোপন কথা কাউকে খুলে বলতে। নারীর ভালো লাগা না লাগাকে অজস্র প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তোলা হয়। যাকে মনে হয় নির্বোধ শিশুর মতোই সরল। সেই হয়ে পড়ে সন্দেহগ্রস্ত।

অথচ নারীর ভালোবাসা ও একাগ্রতা বিশ্বস্ততায় নিবেদিত থাকে একজনের প্রতি। হয়তো প্রতিদানে সে এমন কিছুই পায় না। শত গঞ্জনা আর ধিক্কারেও তার ভালোবাসা দ্বিধান্বিত হয় না। পড়ে না মুখ থুবড়ে। অথচ একজন নারীর বিরাগে ক্ষিপ্ত পুরুষ অন্য নারীর প্রতি ছুঁড়ে দেয় অবহেলা। সাধারণভাবে বিচার করে যায় আর সকলকে। মানুষ জীবনের বাজে এবং কুৎসিত সব সত্যগুলোকে চেপে রেখে সুন্দর এবং নিষ্পাপ বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করে থাকে। তিক্ত সত্যকে গোপন করে সুন্দর মিথ্যা নিয়ে আলোচনা করাটাও এক ধরনের ফাঁদেরই শামিল।

এর অর্থ হবে এইরকম জীবন একটি নরম কার্পেট যার উপর দিয়ে খুব নিরাপদে কোমল পায়ে হেঁটে বেড়ানো যায়। এরকম মিথ্যা দ্বারা মানুষ নিজকে

কেবল মাত্র আশ্বস্তই করতে পারে। কিন্তু জীবনের পথ তো নরম কার্পেটে মোড়া নয়। জীবনের রাস্তায় থাকে অসংখ্য ইট, সুড়কী ও পাথর বিছানো। যেখানে পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খেতে হয় বার বার। এখানে লোহার জুতো পরলেও কোন লাভ নেই। লোহার জুতো হয়তো বা পা বাঁচাবে কিন্তু কেউ যদি মাথায় পাথর মারে তবে কে রক্ষা করবে? ভালোবাসা কি? ভালোবাসা কি একটি বড় কোন তামাশা যা অশান্ত পৃথিবীকে শান্ত রাখে? সর্বত্র ভালোবাসার কথা শোনা যায়। ধর্ম, বিজ্ঞান সাহিত্যে রাজনীতিতে সর্বত্রই ভালোবাসার কথা বলা হয়। সকল প্রকার দুঃখের ঔষধ হিসাবে ভালোবাসাকে দাঁড় করিয়ে মানুষের দেহ এবং আত্মার সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। জগৎ সংসারের নানা জাতির এবং পরিচয়ের মানুষকে যে চিনেছে জেনেছে তার পক্ষেই তো সত্যিকারের ভালোবাসাকে শনাক্ত করা সম্ভব। ভালোবাসাই তো ভালোবাসাকে চিনে নেয়।

বুড়ো মানুষ প্রাজ্ঞ মানুষ

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

কবি মানব মনের আকাঙ্ক্ষাটুকু তার কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এ যে কেবলই আকাঙ্ক্ষা, মানব শিশু জন্মাবে, ক্রমশঃ বড় হতে থাকবে। একদিন বার্ধ্যকে পৌছার পর ইহধাম ত্যাগ করতে হবে এই তো প্রকৃতির নিয়ম। বয়সের সঙ্গে দৈহিক কর্মক্ষমতার যোগসূত্র রয়েছে। সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর একজন মানব শিশু সাবালকত্বের শীর্ষে পৌছে। যৌবন শেষ হয়ে প্রৌঢ়ত্ব শুরু হয় চল্লিশ বছরের পর থেকে। সেই সময় থেকেই মানুষের দৈহিক ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

মানুষ মাত্রেই সুন্দর ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে কিন্তু বার্ধক্যের অমোঘ পরিণতির বাইরে কেউ যেতে পারে না। যখন কোন মানুষকে আশীর্বাদ করা হয়। তখন শতায়ূ লাভের জন্য কামনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে শতায়ূ লাভ করতে পারেন খুব কম ভাগ্যবান লোক। শত বছর অতিক্রান্তের পেছনে পারিবারিক ধারা, পরিবেশ, মানসিকতা জীবন যাত্রার ধরন ইত্যাদি অনেকাংশে কাজ করে। তবে হ্যাঁ আগের তুলনায় আজকাল আমরা বেশীদিন বাঁচি। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি ও জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কারের ফলে মানুষের গড় আয়ু আগের তুলনায় বেড়েছে।

তবে এত করেও একশ' বছরের উপরের মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। উন্নত স্বাস্থ্যবিধির জন্য মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে বটে। তা কিন্তু প্রাচীনকালের বয়স্ক মানুষের আয়ুকে ছাড়িয়ে যায়নি। প্রতিটি প্রাণীরই আয়ুর একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। যেমন কচ্ছপ প্রায় একশ' বছর বাঁচে। কিন্তু মানুষ উন্নত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সত্বেও একশ' বছর খুব কম লোকই বেঁচে থাকে।

এ সংসারে এমন কোন লোক নেই যে বুড়ো হতে চায়। কালের নিয়মে বয়েস বেড়ে চলে একথা সবার জানা। কিন্তু এতকিছুর পরেও মানুষ বুড়ো হতে চায় না। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের সজীবতা কামনা করে। অসুখ বিসুখ, পরনির্ভরশীলতা, স্মৃতিলোপ ইত্যাদি কারোই কাম্য নয়। তরুণ বয়সে তো নয়ই এমনকি বার্ধক্যেও

মানুষের মনে মৃত্যুচিন্তা স্থান পায় না। মানুষ নিয়তই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারপরও মানুষ ভাবে তারা চিরকালই বেঁচে থাকবে। প্রেরণা ও আশাই হলো জীবনের চালিকাশক্তি, আশাহীন লোক সর্বদা মৃত্যুচিন্তায় বিভোর থাকে। জীবধর্ম বজায় রাখতে গিয়েই মানুষ মৃত্যুকে ভুলে থাকে। কিন্তু মৃত্যুকে ভুলে থাকলেই তো আর অমরত্ব লাভ করা সম্ভব নয়? বার্ধক্যে যৌবনের মহিমা ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন। কিন্তু তাই বলে মানুষ তার হাল ছেড়ে দেয়নি। বার্ধক্যের সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো যোগ হয়ে অনেক সময় বার্ধক্যকে তরান্বিত করে।

প্রৌঢ় বয়সে মানুষের মাঝে বার্ধক্য চিন্তা বেশী দেখা যায়, কতদিন বাঁচবো, মৃত্যুর সময় আপন জনেরা কোথায় থাকবে, শেষ জীবনে কে দায়িত্বভার নেবে? স্বামী স্ত্রী কে আগে মরবে? শরীর সুস্থ্য থাকবে কিনা, আর্থিক অনটন হবে কিনা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন মনের কোণে এসে জমা হয়। বার্ধক্যে কেউ কেউ বাকপটু হয়ে পড়েন। কেউ আবার পারতপক্ষে কথাই বলতে চান না। কেউ ধর্মের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়েন। কেউ কেউ আবার জ্যোতিষীর কাছে ছোটেন। এমন অনেকে আবার সংসারের জন্য প্রাণপণ খেটে যান। যাতে বুড়ো বয়সে নিশ্চিন্তে দিনগুলো কাটে। মহিলারা ছেলে-মেয়ে নাতী-নাতনী ইত্যাদি নিয়ে মেতে উঠেন। পুরুষরা ছেলেদের ভালো চাকুরী মেয়েদের ভালো বিয়ে। বাড়ী গাড়ী ব্যাংক ব্যালেন্স ইত্যাদিতে মেতে থাকেন। চাকুরিতে কিংবা ব্যবসায় উত্তরোত্তর উন্নতি। অতঃপর যখন অবসর যাপনের সময় আসে তখন ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই বেমানান হয়ে পড়েন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মন-মানসিকতায় বিস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে হতাশা ও অভিমান এসে মনে ভর করে। মন স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। পরিজনদের কথা বাঁকা মনে হয়। নিজেকে সংসারে অপাংক্তেয় মনে হয়। বুড়ো মানুষদের আচার ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে বিরাট ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়। জীবনের চাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রের বিরাট ব্যবধানই এই সমস্যার মূল কারণ। সাংসারিক জীবনে অশান্তি, অর্থাভাব, নিরাপত্তাহীনতা, আপনজনদের বিমুখতা এসব সমস্যাকে আরো বেশী করে বাড়িয়ে তোলে। বৃদ্ধা মহিলাদের ক্ষেত্রে পারিবারিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা। পুত্র বধুদের টানাপোড়েন বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করে থাকে।

এতকিছুর পরেও জীবনের প্রতি আগ্রহ কোন মানুষেরই কম নেই। বার্ধক্যে শরীর ভাঙ্গলেও মন সতেজ থাকতে পারে। বার্ধক্যে মানুষ শান্তি খোঁজে। সুখকর পরিতৃপ্তির পরিবর্তে নির্ভরতা খোঁজে। ছেলেবেলায় মা-বাবার কাছে যেমন নিরাপত্তা ও আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। তেমনি আশ্রয় আর নিরাপত্তার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে মন। কিন্তু কে দেবে আশ্রয়? সমাজ সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে শরীরকে অবহেলা

করতে শুরু করেন অনেকে। আবার অনেকে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত শরীর ভাবনায় মশগুল থাকেন। বুড়োরা ছাড়াও চল্লিশোর্ধ লোকেরাও অযথা ডাক্তার এবং ওষুধের প্রতি বেশী মাত্রায় ঝুঁকে পড়েন। সমাজের স্বাস্থ্য সংস্কৃতির বিজ্ঞাপন আলোচনা নার্সিং হোমের প্রচার মানুষকে চিকিৎসা কেন্দ্রিক জীবনের অংশীদার করে তোলে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মূল চাবিকাঠি কখনোই ওষুধ শিল্পের কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রচারে আসতে দিতে চান না। এই অবস্থায় বৃদ্ধরাই ডাক্তার ও ওষুধের উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। প্রবীনদের নিকট থেকে আমরা স্নেহ ও প্রজ্ঞা আশা করে থাকি। সুতরাং আমাদের আশা পূরণ করার জন্য তাদের প্রতিও আমাদের কিছু কর্তব্য রয়েছে। আমাদের দেশে বৃদ্ধ নিবাসের অবস্থা নেই বললেই চলে। তা ছাড়া অনেকেই তা মেনে নিতে পারেন না। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পরিবারে বাস করা এবং দু'মুঠো অন্ন সংস্থানই অনেক পরিবারে হয়ে উঠে না। তারা তো পরিবার পরিজনদের সাহচর্যের কথা কল্পনাই করতে পারেন না। পুত্র পুত্রবধুদের অনীহা। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের আঁকড়ে ধরার প্রবণতাকে আহত করে তোলে। কারণ সেকালের মানুষদের একালের মানুষদের প্রতি প্রত্যাশা থাকবেই। কিন্তু স্নেহ তো নিম্নগামী বয়স্করাই নবীন প্রজন্মকে স্নেহ করে থাকে। কিন্তু বার্ধক্য তো দ্বিতীয় শৈশব আর শৈশবেই তো স্নেহ ভালোবাসার প্রয়োজন বেশী। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মানসিক অস্থিরতা দূর করার জন্য স্নেহ ভালোবাসা না হোক অন্তত মানবতা মাখা করুণাও তো আমরা তাদের দিতে পারি। দুঃখ ভারাক্রান্ত বেদনা নিয়ে যারা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর শান্তির আশ্রয় থেকে চ্যুত হয়ে তাঁরা কিভাবে দিনাতিপাত করেন আমাদের কি উচিত নয় তা একবারও ভেবে দেখা?

প্রাচীন কালের রাজা বাদশাহ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের শিল্পপতি বিত্তশালী সবারই একই স্বপ্ন। যৌবনকে চিরস্থায়ী করা চাই। অতীতে ধনকুবেররা বিভিন্ন ভেষজ দ্রব্য সেবন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রাত্রি যাপন, বিভিন্ন মন্ত্র তন্ত্র অর্থাৎ যৌবনকে চিরস্থায়ী করার জন্য যত কুসংস্কার ছিল সব কিছুই পালন করতো। বর্তমান বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যৌবন ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। তারা এও বুঝেছেন মানুষ যদি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে এবং বার্ধক্যের কারণ গুলো মেনে চলে তবে দীর্ঘজীবন লাভ করা এবং সেই সাথে সুস্থ জীবন লাভ করা অসম্ভব কিছু নয়। তারপরও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহযন্ত্রগুলি যেমন দুর্বল হয় তেমনি দেহের গঠন ও স্থিতিস্থাপকতায় দৌর্বল্য দেখা দেয়।

এতকিছুর পরও বুড়ো মানুষের বাঁচতে ইচ্ছা করে। তাদের এই ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে তাদের প্রতি আরো একটু সচেতন ও কর্তব্যপরায়ন হতে হবে। সেই সাথে বয়স্ক মানুষদেরও উচিত জীবন যাপনের একটা বিশেষ পদ্ধতি বের করে নেয়া।

বার্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব বলা যেতে পারে। কারণ বার্ধক্যে শৈশবের সঙ্গে প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শারীরিক অক্ষমতা ও পরনির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে শিশু ও বৃদ্ধের মধ্যে কোন রকম তফাৎ নেই আবার বাহ্যিক ভাবেও শিশু এবং বৃদ্ধের মধ্যে মিল রয়েছে। যেমন— বৃদ্ধ ও শিশু উভয়ের কথাবার্তা অস্পষ্ট, এরা উভয়েই কেশবিহীন এবং দন্তবিহীন।

আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমিলও খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন— একজন বৃদ্ধের থাকে বিপুল অভিজ্ঞতা, সেক্ষেত্রে একজন শিশুর অভিজ্ঞতার ভান্ডার থাকে শূন্য। সব কিছুতেই তাই শিশুর কৌতূহল বেশী থাকে। বৃদ্ধের থাকে অতীত। শিশুর থাকে ভবিষ্যত। শিশুর জীবনের শুরু বৃদ্ধের জীবন শেষ। একজন বৃদ্ধ মানুষের অভিজ্ঞতা শিক্ষা ও জ্ঞান নিয়ে যদি পর্যালোচনা করা যায় তা কিন্তু শৈশবের সাথে তুলনীয় নয়। বাস্তবমুখী অর্থকরী ও প্রয়োগজনিত কাজে বৃদ্ধের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তেমন কাজে লাগে না এ কথা অনেকেই যেমন বলে থাকেন তেমনি বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও নিজেদেরকে সংসারে অপ্রয়োজনীয় একজন বলে ভাবতে থাকেন।

বৃদ্ধরা হাটবাজার করেন। বৃদ্ধারা নাতি-নাতনীদের সামলানো এবং রান্না-বান্না করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে বাড়ী পাহারা দেয়া ও নাতি-নাতনীদের স্কুল থেকে আনা-নেয়ার কাজ করে থাকেন। মানুষ যতদিন কোন নির্দিষ্ট পেশায় যুক্ত থাকেন ততদিন নিজেকে একজন মূল্যবান মানুষ হিসেবে মনে করে থাকেন। যিনি অফিসের বড় কর্মকর্তা তিনি ভাবেন যে তার পরিচালনায় চলছে একটি বড় দপ্তর। আবার যে অফিসের পিয়ন সেও নিজের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। তেমনি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ শিল্পপতি ও বুদ্ধিজীবিরা যে যার আসনে বসে সমাজের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে যখন মানুষ অবসর গ্রহণ করে থাকে তখন হঠাৎ যেন তার স্বর্গ থেকে পতন হয়। বিরাট এক শূন্যতা তখন সেই মানুষটিকে ঘিরে ধরে। যে মানুষটি একসময় নিজেকে রাজা মনে করতো। সেই আবার নিজেকে পথের ফকির মনে করে। এ ধরনের এক হতাশা বুড়ো মানুষদের মাঝে বিরাজমান। এভাবে সমাজে নিজেকে অপাংক্তেয় ভাবার পাশাপাশি যদি অর্থনৈতিক অবস্থা জোরদার না থাকে সমস্যা চূড়ান্ত রূপ নেয়। হতাশা মানুষকে আরো অর্থবহ করে তোলে। মানসিক অবসাদ ক্রমশঃ বেড়ে চলে। এভাবে পুঞ্জীভূত বেদনা আর অভিমানের পাশাপাশি বার্ধক্যজনিত ব্যাধি জীবনের অবসান ঘটায়। তবু বুড়ো মানুষদের বেঁচে থাকতে ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে চাইলে বৃদ্ধদের সম্পর্কে আমাদের আরেকটু সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত।

পাশাপাশি বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও নিজের সম্বন্ধে যদি একটু সচেতন হয়। মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য নিজের জীবন যাপন পদ্ধতিতে একটা ব্যবস্থা আনয়ন করলে

বেঁচে থাকাটা অনেক সুন্দর হতে পারে।

সাধারণত প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে তারুণ্যে। সৃজনশীলতা কিংবা প্রতিভার বিকাশ ঘটে যৌবনের প্রথম পর্বে এবং তা পরিপূর্ণতা লাভ করে মধ্য তিরিশে। দেহের পূর্ণতা অর্জনের সময় দেহ সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম থাকে বিধায় কর্মক্ষমতার প্রতিভার নামক দিকটা সর্বাধিক বিকশিত হয়। প্রতিভার স্ফূরণ তারুণ্যে ঘটার অর্থ এই নয় যে শুধুমাত্র তারুণ্যেই সৃজনশীলতা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটবে। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বয়স্ক মানুষের সংবেদনশীল হওয়ায় তাদের সৃজনশীল ক্ষমতা অনেকাংশে বেশী। রবীন্দ্রনাথ সত্তর বছর বয়সেও কাব্য চর্চা করে গেছেন।

দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভ করতে চাইলে আশাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা সকলেরই প্রয়োজন। কিন্তু সেই জীবনের উৎপত্তিস্থল কোথায়? সমাজের তরুণ-তরুণীদের সামনে দীর্ঘজীবন পড়ে আছে। জীবন সম্পর্কে এরা অনভিজ্ঞ, এরা চঞ্চলমতী, সব সময় এরা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অপারগ। বয়স্করা যদি এদের সাথে মেলামেলা করেন। এদেরকে কাজকর্মে নিযুক্ত করে নিজেও এদের সাথে যুক্ত হতে পারেন। প্রয়োজনে এদেরকে কাজকর্মে সহায়তা করে সুন্দরভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক গড়ে নিলে বয়স্করা উপকৃত হবেন।

এ জন্য প্রতিবেশীদের খোঁজ খবর রাখা উচিত। নগরায়ন, শিল্পায়ন, কর্মব্যস্ততা ও প্রতিযোগিতামূলক জীবনযাত্রার কারণে আমরা সমষ্টিগত জীবনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত জীবনকেই বেশী প্রাধান্য দিচ্ছি। পাড়ার প্রতিবেশীদের খোঁজ খবর নেয়া। তাদের সমস্যাগুলোর উৎস সম্পর্কে জানা। ক্লাব, লাইব্রেরী নাগরিক সংঘ ইত্যাদিতে যোগদান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ধীরে ধীরে আমরা সমাজের মানুষরা মনুষ্যসঙ্গবঞ্চিত হয়ে পড়ছি। অথচ মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীবন মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। মানুষের অস্বাভাবিক শারীরিক ক্ষমতা নেই। আছে সীমাহীন বুদ্ধি। বুদ্ধি ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে মানুষ তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতে পারে। যেন অবসরের দিনগুলোতে কারো গলগ্রহ না হতে হয়। যৌবনের কর্মময় দিনগুলোতে কাজের ফাঁকে সপ্তাহান্তে একটুখানি অবসর মনে স্বস্তি এনে দেয়। কিন্তু অবসরকালীন সময়ে দীর্ঘ অবসর মানুষের মনে হতাশার সৃষ্টি করে। তখন বয়স্ক লোকেরা গল্প করার সাথী খুঁজতে থাকে। কিন্তু কেউ তখন আর তাদের সমব্যথি হতে চায় না। আশে পাশে যে দু'একজন বৃদ্ধ লোক থাকেন তাদের সাথে কথা বলে মনে আরো হতাশার সৃষ্টি হয়। কিন্তু মানুষ যদি তার কর্মময় জীবনে কোন সৃষ্টিশীল কাজের সাথে জড়িত হতে পারে তবে তার মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় না। এজন্য মধ্য বয়স থেকেই যে কোন গঠনমূলক কাজ খুঁজে নিয়ে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে জড়িত রাখলে নিঃসঙ্গতা মনে হাতাশার জন্ম দেয় না।

এইজন্য লাইব্রেরী, ক্লাব, খেলাধূলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বয়স্ক লোকেরা যুক্ত হতে পারেন। সমবয়সী, মিশ্র বয়সীরা বিভিন্ন আনন্দদায়ক কর্মকান্ডে এদের যুক্ত করতে পারেন। এই বয়সে অনেকগুলো সামাজিক চরিত্র থাক, উচিত। মনে রাখা উচিত খ্যাতি ও অর্থের চাইতেও দুর্লভ সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকা।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে পারিবারিক ভালোবাসা

মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। মানুষের জীবনে সামাজিক জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সামাজিক জীবনেও মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে। কারণ আমরা সবসময় সমাজের মানুষের সাথে চলাচল করি না। সারাদিনের কর্ম শেষে কখনও না কখনও পারিবারিক জীবনে ফিরে আসতেই হয়। তাই পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম একক।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষের আশ্রয়স্থল হলো সমাজ। কিন্তু মানুষের জীবনে পারিবারিক জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃদ্ধকালকে দ্বিতীয় শৈশবও বলা হয়ে থাকে। দীর্ঘকালের মূল্যবোধ, ভালোবাসা, স্নেহ, প্রেম, প্রীতির মধুর সম্পর্ক পরিবারের মানুষদের মাঝে গড়ে উঠে। এই সম্পর্কের মাঝেই মানুষ নিরাপত্তা খুঁজে পায়। তাই দ্বিতীয় শৈশবে এঁসে বৃদ্ধরাও ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধু, জামাতা এবং নাতী-নাতনীর মাঝে আশ্রয় খুঁজে ফেরে। বর্তমানের নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে মানুষ খুব বেশী মাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা পরিবারের মাঝেও প্রবেশ করেছে। ফলে পরিবারের লোকেরাও স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। আর তাই পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে। মা-বাবা ভাই-বোনরা স্নেহের বাঁধন ছিন্ন করে ফেলছেন। নিত্য কলহ, পারিবারিক বিভিন্ন টেনশানও পারিবারিক ভাঙনের পেছনে আরেকটি কারণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বৃদ্ধ মা-বাবার সাথে উপার্জনক্ষম সন্তান-সন্ততিরা সম্পর্ক রাখে শুধুমাত্র বাড়ী পাহারা, রান্না বান্না এবং শিশুদের স্কুলে আনা নেয়া ও হাট বাজার করবার জন্য।

তবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এ সমস্যা সব পরিবারে ঘটে না। এখনও কিছু কিছু পরিবার আছে যেখানে তারা স্নেহ, মায়া-মমতার বন্ধনে সসম্মানে আজও বসবাস করছেন। তবে এদের সংখ্যা খুব নগণ্য। বয়স্কদের শুধুমাত্র স্বার্থের জন্য সমাদর করা হয় না। পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা মূল্যবোধের কারণেই বয়স্কদেরকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখানো হয়।

এইভাবে কিছু কিছু পরিবারে আজও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সম্মান বজায় থাকলেও বেশীর ভাগ পরিবারে এই সম্মান দেখা যায় না। পারিবারিক পরিবেশ অনুকূল না

হলেও আর্থিক অসঙ্গতি এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য বৃদ্ধা-বৃদ্ধারা পরিবারের সদস্যদের সাথে মানিয়ে চলেন। শান্তির জন্য, স্নেহের কারণে অথবা বৃদ্ধাবস্থার অসহায়ত্বের কারণে পরিবারের সদস্যদের সাথে মানিয়ে চলেন। কিন্তু এতে করে কি শান্তি আসে? বৃদ্ধ বয়সে মানুষ একটু স্বস্তির জীবন কামনা করেন। সুখে কিংবা আমোদে থাকার চাইতে স্বস্তি তাদের জীবনে শান্তি আনয়ন করে।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অশান্তির পিছনে যুগগত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা দায়ী। সাধারণত কিছু কারণে এসব সমস্যা ঘটে থাকে। যেমন যুগগত পরিবর্তনের কারণে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছেলে-মেয়ে নাতী-নাতনীর কার্যকলাপ মেনে নিতে চান না। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে যে সবকিছুর পরিবর্তন হয় এটুকু তাঁরা বুঝতে চান না। এভাবে পোশাক-আশাক, রান্না-বান্না, বাচ্চা মানুষ করা সবকিছুতেই তারা গরমিল খুঁজে থাকেন।

পারিবারিক জীবন ব্যতিতও সমাজ ব্যবস্থা, বিভিন্ন পছন্দ-অপছন্দ যেমন খাওয়া-দাওয়া, গানশোনা, টিভি দেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নতুন প্রজন্মের সাথে গরমিল লক্ষ্য করা যায়। এভাবে ধীরে ধীরে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

এক্ষেত্রে বয়স্কদের বোঝা উচিত যে, পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তিই ভিন্ন প্রকৃতির। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আসনে যোগ্য, বিবেচক, মর্যাদাসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান। সুতরাং এদেরকে অযাচিত ভাবে উপদেশ দিয়ে তাদের মতান্তর ঘটানো ঠিক নয়। অযাচিতভাবে উপদেশ দিলে যে কোন মানুষের মাঝে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো যুগের দাবীকে মেনে নেয়া।

অপরের কাজ যা অপছন্দ হবে তা নিয়ে ঝামেলার সৃষ্টি না করাই ভাল। নিজের মতামতকে জোরপূর্বক অন্যের মতের উপর যাতে প্রতিষ্ঠা না করা হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। নিজের অবস্থানটুকু জেনে কোথা থেকে শুরু করতে হবে এবং কোথায় শেষ করতে হবে এটুকু বোঝা উচিত।

পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি যারা সাংসারিক কাজে নিয়োজিত তাদের সাথে মিলেমিশে তাদের অনুমতি নিয়েই যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করা ভালো।

এজন্যে এ বয়সে অন্যের মনোবিকারের কারণ না হয়ে কিছুটা আলগাভাবে থাকা উচিত। নিজের সম্মান যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে দৃষ্টি থাকা উচিত। নিজের মাঝে একটা আলাদা জগত সৃষ্টি করে নিয়ে সুস্থভাবে সম্মান নিয়ে বাঁচা সকলেরই কাম্য।

যেসব পরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ত্যাগ করা হয় তাদের দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না। কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন মন-মানসিকতা সম্পন্ন পরিবারের লোকজনের সাথে মানিয়ে চলা অত্যন্ত কষ্টকর। আর তাই পরিবারের মাঝে শান্তি খুঁজে না পেলেও সামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকলে অন্ততপক্ষে আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

বৃদ্ধের জীবন যাপনের প্রস্তুতি

অর্থকষ্ট কিংবা শারীরিক অসাচ্ছন্দ এই দুইয়ের মাঝে যদি কোনরকম বৈরীতা না থাকে তবে বৃদ্ধ বয়সে মানুষের প্রধান শত্রু হচ্ছে তার মন। মানুষের জীবনের দীর্ঘদিনের অভ্যাস, মানুষের মন-মানসিকতা অহংবোধ মানুষের মাঝে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সমস্যাই বৃদ্ধ বয়সে প্রকট আকার ধারণ করে থাকে।

মানুষ যখন প্রৌঢ়ত্বে প্রবেশ করে তখনই জীবনের হিসেব নিকেশ শুরু করে বাকী দিনগুলোর চিন্তায় চঞ্চল হয়ে পড়ে। যৌবনে এই ভাবনা চিন্তাগুলোর অবকাশ থাকে না। যৌবনে সংসার সম্পর্কে মানুষের অতটা অভিজ্ঞতা থাকে না। সংসারের রূপরেখাটাও বুঝে ওঠা যায় না। প্রৌঢ়ত্বে মানুষ চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পায়।

বিগত জীবনের কথা চিন্তা করে আগামী দিনের ভাবনায় মশগুল হয়ে পড়ে। বৃদ্ধাবস্থায় জীবন কিভাবে কাটাবে তা একদিনে পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। এরজন্য সর্বপ্রথমে যা প্রয়োজন তা হলো নিজের সাথে বোঝাপড়া করা। আর বোঝাপড়া হবে সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেই।

প্রৌঢ় অবস্থায় কর্মচাঞ্চল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা ভালো। কারণ এই সময় থেকেই মানুষের শরীরে ভাঙন ধরে। কিন্তু যৌবনের কর্মক্ষমতা ও আগ্রহের জন্য মানুষ তা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না। আর তখনই মানুষের শারীরিক বিপর্যয় ঘটে যায়।

এই সময় উচ্চাশাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের ভালোলাগা ও ভালোবাসাকে মূল্যায়নের মাধ্যমে পছন্দসই কোন কাজ বেছে নেয়া উচিত। যেমন বই পড়া, গান শোনা, বাগান করা, লেখালেখি করা। কেউ কেউ আবার যন্ত্র সংগীতের চর্চাও করতে পারেন। আবার কেউ খেলাধুলাও করতে পারেন। স্বামী-স্ত্রী কিংবা পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক সঙ্গীরা মিলিত হয়ে আড্ডাও দিতে পারেন। এসব সখের মাধ্যমে মানুষ নিজের মনকে সতেজ রাখতে পারে। অর্থ, সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি না পেলেও নিজের ভালোলাগাকে মূল্যায়ন করতে পারলে মানুষ নিজের মাঝে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে পারে।

প্রৌঢ় বয়সেই মানুষ জীবনের স্থিতির কথা ভেবে থাকে। এই বয়সেই মানুষ হঠাৎ করে তার জীবনের একাকীত্ব অনুভব করতে আরম্ভ করে। সংসার সম্পর্কে

অনুযোগ, সমাজ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ, নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশা এই তো জীবনের ছবি।

কিছু কিছু মানুষ আবার এই বয়সে অতিরিক্ত কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েন। গাড়ী, বাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বিয়ে ইত্যাদি নিয়ে বেশী মেতে উঠেন। ছেলেমেয়েরা নিজেদের মতো করে চলতে চাইলে তাদেরকে বাঁধা দেয়া হয়। পাড়া-পড়শি আত্মীয়-স্বজনদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়া। এসব যখন অধিক মাত্রায় হয় তখনই হঠাৎ করে শারীরিক বিপর্যয় নেমে আসে। এই বয়সে নিজেকে অতিরিক্ত কাজের মাঝে না জড়িয়ে কিছুটা নিজের মাঝে নিজেকে মেলে ধরা দরকার।

মানুষ যে কাজে আনন্দ খুঁজে পায় তার মূল্য অপরিসীম। শুধুমাত্র দেশ ও দশের জন্য নয়। যে কাজে মানুষ বেঁচে থাকার স্বাধ অনুধাবন করতে পারে সেখানেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। কেউ হয়তো খ্যাতির মাঝে সার্থকতা খোঁজে কেউবা অর্থের মাঝে। কিন্তু এই সার্থকতা কি সার্বিক তৃপ্তি দানে সক্ষম? শর্তহীন কোন কাজের মাঝেই মানুষ আনন্দ খুঁজে পায়। মানুষ যতই বয়স্ক হবে ততই তার উপলব্ধি তীক্ষ্ণ ও পরিচ্ছন্ন হয়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মানুষ বেঁচে থাকার সার্থকতা খোঁজে। এ সময় মানুষ নিজের জন্য জগৎ গড়ে তোলে। মানুষ বৃদ্ধ হয় শরীরে। কিন্তু বৃদ্ধ হলেই বিজ্ঞ হয় না। একমাত্র বয়সই মানুষকে বিজ্ঞতা দান করতে পারে না। বিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতার জন্য নিরলস অনুশীলনের প্রয়োজন। জীবন সাধনা করা দরকার। বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে সৃষ্টিশীলতা। সৃষ্টির মাঝেই জীবন অতিবাহিত হয়। মানুষ কাজের স্বাক্ষর রেখে যায়। সমাজ সভ্যতার পক্ষে কল্যাণকর হলো গভীর জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। যা সমাজ সভ্যতার কল্যাণের জন্য একান্ত দরকারী। বৃদ্ধ যদি নিজকে বিজ্ঞ করে তুলতে চান তবে তার জগৎ হবে আনন্দময়। সমস্যা সংকুল পৃথিবীতে তিনি সুস্থভাবে বাস করতে পারবেন। সমস্ত সুখ দুঃখের উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে জীবনের যাবতীয় তাৎপর্যকে অনুধাবন করে বিশ্বের ধারার সাথে নিজের কর্মধারাকে মিলাতে সক্ষম হবেন।

চেনা ভুবনে অচেনা মন

পৃথিবীতে প্রাণীর অস্তিত্ব যেমন প্রাচীন। মনের সত্বাও তেমনি প্রাচীন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাণী যে কোন বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারে। অভিজ্ঞতা তত্ত্ব জ্ঞান আহরণে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অবদান অনস্বীকার্য। প্রাণীর সহজাত মৌল প্রবৃত্তি হলো ক্ষুধা, ভয়, যৌনতা ও আক্রমণ। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এ প্রবৃত্তিগুলো অপরিহার্য।

ক্রোধ, কামনা বাসনা এবং আক্রমণের সময় অঙ্গ প্রতঙ্গের পরিবর্তনে মানুষ ও পশুতে কোন প্রভেদ নেই। যেমন ক্লান্ত অবসন্ন মানুষ ঘুম পেলে মুখ ব্যাদান করে হাই তোলে পশুও তেমনি করেই হাই তোলে। ক্রোধের সময় যেমন মানুষ দাঁত বের করে চিৎকার গর্জন করে পশুও তাই করে। কিন্তু মানুষ ও পশুতে তফাৎ হলো— মানুষ হলো সেই প্রাণী যারা সচেতন এবং যাদের মধ্যে বোধ বুদ্ধি প্রবল। কিন্তু অপরাপর প্রাণীর তা নেই। তাই পশু কিংবা অপরাপর প্রাণীদের সাথে মানুষের বহু মিল থাকা সত্বেও তারা উভয়ে এক কাতারে সমীচিন নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মন "প্রভাতের আলোর সময়সী"। অর্থাৎ মনকে ছাড়া কোন প্রাণীকে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু মন কি কেউ ছুঁতে পারে? মনকে কি দেখা যায়? কিংবা মনের কি কোন অস্তিত্ব কিংবা স্থিতি রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় জ্ঞানেন্দ্রিয়র সংবাদ বাহক সমস্ত স্নায়ুগুলো যেখানে মিলিত হয়েছে সেটা হলো মস্তিষ্ক। আর মস্তিষ্কই হলো "মন"। আর এই মানব মনের মাঝেই লুকিয়ে আছে এগিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি। মানুষ অতীত থেকে শিক্ষা লাভ করে থাকে। মানুষের মন প্রসারিত হয়ে এগিয়ে চলে নতুনের পথে এবং তা কখনই ফিরে যায় না আদিম আয়তনের দিকে।

মানুষের আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা, চাল-চলন, ধ্যান-ধারণা নির্ভর করে মনের গতি-প্রকৃতির উপর। মানুষের আচার ব্যবহার ও চালচলনে যে পার্থক্য থাকে তার মূল কারণ হল মস্তিষ্ক। মানুষের লজ্জা অপমান ও দুঃখবোধের সময় মুখমণ্ডলের বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু পশুর মধ্যে এ ধরনের রকমফের লক্ষ্য করা যায় না। কারণ পশুর মধ্যে শালীনতা, লজ্জা ইত্যাদি নেই।

শৃঙ্খলা ও ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনে মানুষ সমাজ গঠন করে বিবাহ রীতি চালু করে। যৌনসংসর্গের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করে। ধর্মাশ্রয়ী হয় সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনয়ন করে। মানুষের মন গতিশীল। এই মনে আছে এগিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি।

অতীত কালের মানুষের জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার চিহ্নই হলো আজকের এই মানব সভ্যতা। তাই অতীতকে বাদ দিয়ে বা আলাদা করে বর্তমানকে ভাবা যায় না। বাস্তব জগতে বর্তমানের সৃষ্টি হয়েছে এই অতীতকে ঘিরেই। তাই অতীতকে ভুলে যাওয়া যায় না। চাইলেও মুছে ফেলা যায় না। অতীতের শিক্ষাই আমাদের জ্ঞান আহরণের পথ দেখায়। শান্তির পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করে। আদিকালের শুরুতে মানুষ সহজ প্রবৃত্তির দাস ছিল। ক্রমশঃ মানুষ অনুভব করতে শিখল সমাজে তাকে বসবাস করতে হলে যথেচ্ছাচার স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে।

যথেচ্ছাচার সমাজে বিচ্ছেদ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিধায় সহজ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার পথ যাতে করে সংযত হয় সেজন্য আচার ব্যবহারে বিধি নিষেধ চালু করে মানুষ। এইরকম বিভিন্ন প্রকার ধ্যান ধারণা মানুষ অনুকরণের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় চালু করে বিভিন্ন রীতি নীতির মাধ্যমে। পরবর্তীতে তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত হয়ে রূপ ন্যায় সংস্কৃতিতে।

ভালোবাসা ও সৃষ্টির মধ্যে যে মানুষ একদিন নিজেকে আবিষ্কার করেছিল। সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি অটুট রাখার জন্য নিজেদের উপর নানারকম বিধি নিষেধ আরোপ করেছিল। সে মানুষ লোভ, অহংকার ও শক্তি দম্ভে নিজেকে প্রগতিশীল দেখাতে গিয়ে ভুল পথে চালিত হচ্ছে। প্রগতিশীলতার নামে নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অতীত ও পুরাতন বলে অবজ্ঞা করছে। অথচ এই অতীত বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আজকের এই সভ্যতা। অতীত হলো মানুষের জীবনের জীবন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—

"মন বলে আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাদের উদ্দেশ্যে যাঁরা জীবনের আলো ফেলেছেন
পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।"

(পথের শেষে)

অতীত বর্তমানের কথা বলে যায়। আবার এই বর্তমানই এক সময় অতীত হয়ে যায়। আমরা জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পে সাহিত্যে অতীতের কাছে ঋণী। তাই অতীতকে আমরা মূল্যহীন ভাবলে চলবে না। এ মুহূর্তে যা আমাদের কাছে বর্তমান।

তাই আবার সময়ের বিবর্তনে অতীত হয়ে পড়ে। অতীতকে স্মরণ করার অর্থ কেবল মাত্র অন্ধ অনুরাগ নয়। নতুন ও পুরাতনের মাঝে পার্থক্য এটুকুই সংস্কৃতির নতুন ধারা যখন সচল হয় তখন পুরোনো ধারা অচল হয়ে পড়ে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো নিজের সীমানাকে অতিক্রম করে উর্দ্ধে যাওয়ার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার মাঝেই লুকিয়ে আছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত। তবুও মানুষ থেমে থাকে না। কারণ থেমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজ পরাজয়কে স্বীকার করে নেয়া।

যেখানে যত বাধা বিপত্তি সেখানেই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। অজানাকে জানা এবং অদেখাকে দেখার তাগিদে মানুষ যে কোন ঝুঁকির সম্মুখীন হতে চায়।

এতকিছুর পরেও মানুষ যুগ যুগ ধরে শান্তির অন্বেষায় ঘুরে ফিরছে। মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়। আর শান্তি তখনই বিঘ্নিত হয় যখন চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে। মানসিক অশান্তিতে জর্জরিত জীবন কারোই কাম্য নয়। কিন্তু শান্তির অন্বেষায় যুগ যুগ ধরে মানুষ ছুটে বেড়িয়েছে। কিন্তু শান্তি কি পেয়েছে? কে শান্তিতে আছে? যে দালান কোঠা কিংবা সুরম্য কোন অট্টালিকায় বাস করছে কিংবা যে দিন এনে দিন খেয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে শান্তি যে কোথায়? তার কেউ নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দিতে পারেনি। মানুষ যেখানে শান্তি পায়নি তা ছেড়ে নতুন কোন কিছুর খোঁজে পুনরায় ছুটে চলেছে।

এক পথ ছেড়ে অন্য পথে। নিরন্তর শান্তির অন্বেষা করেই চলেছে। মানুষের মনে চিরকালই কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ এ দ্বন্দ খেলে যাচ্ছে। এক সময় যা ভাল মনে হয়। কিছু সময়ের ব্যবধানে তাকেই মন্দ মনে হয়। এভাবে মানুষ যে সময় কোন কাজকে সমর্থন করে একসময় সে কাজকেই সে অসমর্থন করতে থাকে। নিজের ভুলের জন্য পরিণতির জন্য মন অনুতাপে দগ্ধ হয়ে পড়ে। অপরাধ প্রবণতাটাও এক ধরনের প্রবৃত্তি। অনিশ্চিত ও বন্ধুর পথে মানুষ জেনে শুনেই পা বাড়িয়ে চলে। নিজের কর্মের জন্য মানুষ নিজেও কিন্তু কম দায়ী নয়।

মানব সভ্যতাকে কলংকিত করেছে মানুষেরই অজ্ঞতা ও সংস্কারাচ্ছন্ন মন। ব্যক্তি বিশেষ যে সত্যকে উপলব্ধি করে সেটাকেই তারা চূড়ান্ত ভেবে বসে থাকে। অথচ সত্যে পৌছাতে চাইলে কোন ব্যক্তিবিশেষের মতই যে চূড়ান্ত নয় এটুকু ভুলে গিয়ে আমরা মানুষ্যত্বের অবমাননা করে থাকি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা আত্মবিশ্লেষণ না করেই নিজের সম্পর্কে অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকি। ক্ষণিকের ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। সহনশীল মানুষ জীবনের যে কোন দুর্বিপাকেই উপকৃত হয়ে থাকেন। তারপরেও মানুষ তো আর যন্ত্র নয়। তাই জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে থাকে যা মানুষকে অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে

এ অসহনীয়তার জন্য হয়তো ব্যক্তিজীবনে সে উপকৃত হয়েও থাকে। আবার এই সহনশীলতার অভাবই ব্যক্তির জীবনে দুর্বিপাক ডেকে আনে। মানুষ যখন নিজেকে চিনতে শেখে তখন সে অপরের যে কোন কাজে সহনশীলতার পরিচয় দিতে পারে।

যারা কেবলই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে চলে তারা জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই বলে মানুষ অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয়। শত জ্ঞানী মানুষও কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞানতার পরিচয় দিতে পারে, বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে পড়ে নির্বুদ্ধি। কর্মক্ষম মানুষ হতে পারে অক্ষম। আর সম্ভবত এটাই হচ্ছে মানুষের অদৃষ্ট।

কিন্তু তাই বলে মানুষ অদৃষ্টের কাছে নতি স্বীকার করবে এটা কারোই কাম্য নয়। প্রতিটি মানুষেরই আত্মপ্রত্যয় থাকা চাই। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে আত্মপ্রত্যয়ই সহায়তা দান করে থাকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা ভালো। কিন্তু তার জন্য যদি মানুষ লোভী হয়ে পড়ে তখনও মানুষের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। প্রতিটি কাজেই চেষ্টা আবশ্যক। চেষ্টার পরেও আমরা যা পাই না তাকেই আমরা অদৃষ্ট বলে জানি। অনেক সময় আমরা আমাদের ক্ষমতা যাচাই না করে কাজে হাত দেই। প্রতিটি মানুষেরই আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজ ক্ষমতা যাচাই করা উচিত। যে জিনিসটি আমাদের নাগালের বাইরে তা নিয়ে হা হুতাশ করে কোন ফায়দা নেই। মানুষ নিজের যোগ্যতা যাচাই না করে ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবে যে বিস্তর ফারাক। এ সত্যটুকু আমরা কতটুকু বুঝি? কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে বাস্তবতাকে অস্বীকার করলেই সেখানে শান্তি বিঘ্নিত হয়।

যা কিছু আমাদের সাধ্যের মাঝে সেটুকু মেনে নেয়ার ক্ষমতা সবার মাঝে থাকা উচিত। সাধ্যের বাইরের কোন কিছু নিয়ে অযথা দুঃখ পেয়ে লাভ নেই।

এটা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। এবং এ সত্যটুকুর মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারলেই হৃদয়ের শান্তি অর্জন সম্ভব। মানুষের দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়, রক্ত, শিরা, স্নায়ুতন্ত্র, যকৃত ইত্যাদি বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংগঠিত পারস্পরিক ক্রিয়ার সমষ্টি হলো দেহ। দেহকে আবৃত করে রেখেছে দেহের চামড়া। এ দেহের চামড়ার বর্ণ অর্থাৎ গাত্র বর্ণ দেখে আমরা মানুষে মানুষে পার্থক্য করে থাকি। এভাবে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষকে পৃথক করা যায়। কিন্তু এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রভেদ সম্ভব নয়। এখানেই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের শারীরিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক, এই হচ্ছে মন, তাবৎ সংসারে জাল ফেলে মন। অথচ মানুষ জানে না মনের আবাস কোথায়। মন মানুষের অতি আপন। মানুষ মন নিয়ে জন্মায়, বড় হয়। মন দিয়েই সৃষ্টি হয়। কিন্তু মনকে নেড়েচেড়ে দেখানো যায় না। এর অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

তারপরও মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য পূর্ণতার দিকে যেতে নিখিল মানবলোককে স্বপ্নে ও জাগরনে অবিশ্রাম আহ্বান করে মন। মানুষের পছন্দ বা অপছন্দ যাই থাক না কেন এটা স্বীকার করতে হবে সমস্ত সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই তো সত্য। মানুষ অজ্ঞানতা অহংকার এবং মূঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় থেকে বের হতে পারলেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে। সীমাবদ্ধতা সত্যকে ঢেকে রাখে। সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হলেই মনের সত্যকে জানা সম্ভব।

মুখোশের আড়ালে নিজেকে চেনা

আমি কে? কি আমার পরিচয়? তখন হয়তো আমরা উত্তর দিয়ে থাকি আমি অমুক কিংবা তমুক। এই অমুক কিংবা তমুক হলো প্রতিটি মানুষেরই পোশাকী পরিচয়। একজন মানুষের বাইরের পরিচয়টুকু সবাই জানে। যদি সমাজে তার একটি নির্দিষ্ট পরিচয় থাকে। আচরণ যদি হয় ভদ্র, মার্জিত এবং পোশাকী। কিন্তু তার ভেতরের পরিচয় তো সে নিজে ভিন্ন আর কেউ জানার কথা নয়। মানুষের বাহ্যিক পরিচয়ের যে আবরণ তাকে ঢেকে রাখে। সে পরিচয় কতটুকু খাঁটি এটুকু সে নিজেও অবগত নয়।

বাহ্যিক মুখোশের আড়ালে আমরা নিজেকে কতটুকু ঢেকে রাখছি? সে আবরণ খুলে ফেলে নিজের মুখোমুখি কি কখনও হতে পেরেছি আমরা? প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন উপমার কারুকার্য গায়ে মেখে মুখোশের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখছি।

নিজেকে নিজের বিবেকের আয়না থেকে সরিয়ে অন্য কারো দিকে তাকিয়ে আছি। যে আমি আজো আমাকেই চিনতে পারলাম না দেখা যাচ্ছে সে আমিই অন্যের পরিচয় উদঘাটনে সদা ব্যস্ত। আমি নিজে কি? আমার নিজের বুদ্ধি বিবেককে বিসর্জন দিয়ে অন্যের রুচি, সংস্কৃতি, নির্দেশ এগুলোকে আমার অঙ্গে ধারণ করে নিয়েছি। নিজের অন্তরের সৌন্দর্য কোথায় লুকিয়ে আছে। তা অবলোকন করার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছি আমরা। পৃথিবীতে একা কোন মানুষই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকেই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাই বলে সব মানুষের জীবন স্পন্দন তো আর এক হতে পারে না। হতে পারে মানুষের সম্পর্ক পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি মানুষই একে অপরের প্রতিশব্দ। এতকিছুর পরও প্রতিটি মানুষই যদি নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয়কে মেলে ধরি তবে কি আমরা আমাদের সত্যিকার পরিচয় পেতে পারি? নিজের চোখকে আমরা কতটুকু ফাঁকি দিতে পারি? আমরা যা বলি তা করি না। আবার যা করি তা বলি না।

মানুষ জীবন একবারই যাপন করে থাকে। জীবন বারে বারে ফিরে আসে না। সুতরাং আমাদের মূল্যবান সম্পদই হচ্ছে জীবন। অথচ এই জীবনটাকেই আমরা

সবচাইতে বেশী ফাঁকি দিয়ে যাই। আমাদের অধিকাংশ মানুষের জীবন অসচ্ছ। অধিকাংশ মানুষেরই জীবনের কোন উদ্দেশ্যই নেই। যদিও মানুষের জীবনের সকল উদ্দেশ্য এবং সকল চাওয়া পাওয়ার পরিসমাপ্তি কখনও ঘটে না। তারপরও কথা হলো আমাদের জীবন ধারণের যদি কোন উদ্দেশ্যেই না থাকে তবে মানুষে ও পশুপাখিতে কোনই তফাৎ থাকে না। প্রতিটি মানুষেরই বেঁচে থাকার আগ্রহ ও প্রচেষ্টা রয়েছে। কিন্তু আমাদের এই উদ্দেশ্য ঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত নয়। জীবনকে সঠিক পথে চালিত করতে চাইলে জীবনের মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনুষ্যত্ববোধ অর্জনের দরকার রয়েছে। জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের পথ, মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ যতই কন্টকাকীর্ণ হোক না কেন দশের প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতার পরিচয় দেয়া মানুষের বিবেকের পরিপন্থি। অন্যায়, অসত্য, অসুন্দর যতই আনন্দের উৎস হোক না কেন। সত্য সত্যই, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন চলার পথকে সুগম করতে হলে সত্যকে যাচাই করেই পথ চলতে হবে। ঘরে বসে থেকে যদি আমরা বলি মিথ্যাচার খসে পড়বে। সত্যের জয় একদিন হবেই। এতে করে সমাজের দুর্গতি কোন অংশে কমবে না। নিজের স্বার্থ ও ফুর্তির জন্য গভডালিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে কালযাপন করা কোন বিবেকবান মানুষেরই কাম্য নয়। অর্থহীন জীবন, মূল্যহীন জীবন, পথহীন জীবন, বিশ্বাসহীন জীবন আত্মমর্যাদাবোধকে খাটো করে ফেলে। জীবনকে অর্থবহ করতে চাইলে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অবশ্যই থাকা চাই। জীবনকে শ্রদ্ধা করতে চাইলে জীবনে আত্মবিশ্বাসী হওয়া চাই। আত্মবিশ্বাসী হওয়া এই নয় যে অন্যের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা। কারণ প্রতিটি মানুষই অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়। আর এই অধিকার আদায়ের প্রশ্নেই মানুষের যত দুঃখ যত বেদনা। মানুষ নিজের স্বাধীন মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যুগে যুগে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে। জীবনের মর্যাদা রক্ষার্থে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে অনেককে। তারপরও জীবনের দাবী মানুষকে থেমে থাকতে দেয়নি। মানুষ কখনও থেমে থাকতে পারে না, মানুষ যদি থেমেই যেত তবে সভ্যতার বিকাশ কখনই ঘটতো না। আদিম অবস্থা থেকে শুরু করে বর্তমান সভ্য সমাজ তৈরির মূলে রয়েছে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও মানবিকতার সংমিশ্রণ।

মানুষ শিক্ষা অর্জন করে কেন? শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি? আমরা জানি শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় টেনে নিয়ে আসে। কিন্তু শিক্ষা যদি মানুষের অস্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকে বিপন্ন করে। শিক্ষিত লোকদের কার্যকলাপ যদি নৈরাশ্যজনক হয়। শিক্ষা যদি অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হতে পারে। তবে সমাজের অনিবার্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে কারো রক্ষা নেই। শিক্ষার আলো মানুষের বিবেককে প্রসারিত করে। মানব সমাজের অস্তিত্বকে করে তোলে পরিচ্ছন্ন ও কল্যাণকর।

কিন্তু শিক্ষিত সমাজ যদি অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে পড়েন। সেখানে মুক্ত চিন্তা ব্যহত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পথে-ঘাটে ঘরে-বাইরে সব খানেই শোনা যায় অন্যের অপরাধের বর্ণনা। যে কোন ছুতো পেলেই অন্যের নামে একগাদা ফিরিস্তি বর্ণনা করা, এ যেন "চোরের মায়ের বড় গলা"। মানুষ নিজের সত্যিকার পরিচয় গোপন করতে সদা ব্যস্ত। নিজের দোষ চেপে নিজের গুনগানে মুখরিত হয়ে উঠে। নিজের সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য মানুষ সর্বদা অন্যের সঙ্গে প্রতারণা করে চলছে। স্বরূপটাকে ঢেকে দিয়ে অন্যের রূপ প্রকাশে সদা ব্যতিব্যস্ত থাকে। মানুষের চলার শেষ সীমানা কোথায়? মানুষ কতদূর নিজেকে নিয়ে যেতে পারে তা নিয়ে কখনও তারা ভাবে না। গড্ডালিকাপ্রবাহের টানে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলার জন্য চলতে থাকে। জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই বিধায় প্রতিরোধ আসলে চিরদিনের জন্য থেমে যায়। মানুষ নিজের মনের আয়নায় যদি নিজেকে বোঝার চেষ্টা না করে। তবে জীবনের অনুভূতি তার মাঝে জাগ্রত হয় না। নিজেকে বুঝতে চাইলে অস্তিত্বের মাঝে অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। আর এই অনুভূতি জাগরণের জন্য প্রয়োজন গভীর সাধনা। যে মানুষ নিজেকে ফাঁকি দেয় সে নিজেই ঐ ফাঁকির ঘেরটোপে আটকা পড়ে যায়। জীবনকে ফাঁকি দিয়ে কেউ পালিয়ে বেড়াতে পারে না। একদিন তার কাছে জীবনটাই শূন্য হয়ে পড়ে। জীবন চলার পথে চলতে গেলে এমন পথে চলা উচিত যে পথ অর্থবহ। উদ্দেশ্যবিহীন পথে চলতে গেলে নিজের তো ক্ষতি হয়ই সেই সাথে যারা তার সাথে জড়িত সেই সকল মানুষও ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কোন্ পথে চললে মানুষ ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবে। সমাধানের পথ কোন্‌টি তা মানুষকে নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। ভালো পথ স্বেচ্ছায় মানুষের কাছে ধরা দিবে না। সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা মানুষকে বুঝতে হবে কোন্‌টি ভালো আর কোন্‌টি মন্দ পথ।

অপরের বক্তব্য শোনা ভালো। কিন্তু সব সময় অপরের বক্তব্য অনুযায়ী সব কিছু মেনে চলতে হবে তা কিন্তু ঠিক নয়, মানুষভেদে দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অন্যের কথা বিশ্বাস করতে হবে এটা ঠিক নয়। ভালো, মন্দ, ন্যায়, অন্যায় বিচার করার ক্ষমতা বিবেকবান মানুষের থাকা উচিত। "চিলে কান নিয়ে গেছে" এটা ভেবে চিলের পেছনে না দৌড়ে নিজের কানে হাত দিয়ে দেখা উচিত। প্রতিটি মানুষের মাঝেই দোষগুণের সংমিশ্রণ রয়েছে। এমন কোন ব্যক্তি নেই যে সর্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাই সর্বক্ষণ নিজেকে বড় মনে করা অহমিকার পরিচায়ক।

এমন অনেকে আছেন যে না বুঝেও বোঝার ভান করেন। প্রতিটি ব্যাপারেই নিজের সীমিত জ্ঞান ফলাতে চান। যা অপরের নিকট বিরক্তিকর। নিজের সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা ভালো। নিজের জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা থাকলে অপরকে ছোট

করে কেউ দেখবেন না।

আমরা অনেকে সমস্যায় পতিত হলে সমাধানের জন্য অন্যের কাছে ছুটে যাই। অপরের মতামত যাচাই করা ভালো। তবে আমরা যদি নিজেকে বুঝতে পারি তবে সমস্যার সমাধান আমরা নিজেরাই করতে পারি। কারণ আমরা প্রতিটি মানুষই কোন না কোন সমস্যার সাথে জড়িত। এছাড়া যে সমস্যা নিয়ে আমরা কোন একজন ব্যক্তি বিশেষের কাছে যাই, সেই বা কতটুকু সেই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন তা বুঝবো কিভাবে? সে হয়তো নিজের বিদ্যা ফলাতে গিয়ে ভুল সমাধানও দিতে পারে। তাই অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র চিন্তা সমাধান দিতে পারে।

"আমি মানুষ" এ কথাটি আমি জোর গলায় বললাম অথচ আমার কার্যকলাপে যদি অমানবিকতার পরিচয় মেলে তবে আমি কে? আমি কি হতে পারি? আচরণে আমার যদি সংযত ভাব না থাকে, আমি যদি অবিবেচক হই, আমার দ্বারা যদি মানবাত্মা অপমানিত হয় তবে আমি কি মানুষ নামের যোগ্য হতে পারি? যে মানুষ অনধিকার চর্চা করেন না। যার ভাবনা চিন্তা ও কর্মে থাকে সৌজন্য, ন্যায়বোধ, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যবোধ সেই তো মানুষ নামের যোগ্য। প্রতিটি মানুষের মাঝেই ভালো ও মন্দের মিশ্রণ রয়েছে। গুণের বিবেচনায় কেউ পরিপূর্ণ মানুষ নন। অমানুষ সেই যে মানুষের সাথে প্রতারণা করে। অন্যের ক্ষতি যে চিন্তা করে সেই মানুষ নামের অযোগ্য।

যে মানুষ অন্যের স্বার্থে আঘাত হানে, যে মানুষ অহরহ মিথ্যার আশ্রয় নেয়, যার চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অন্যের সম্পদ হানি হয়। যে মানুষ সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে দায়িত্বজ্ঞানহীন। যে মানুষ তার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করে না। অলসতার দরুন যে ব্যক্তি পরিবারের প্রতি বোঝাস্বরূপ সেই তো মানুষ নামের অযোগ্য। দুর্বল ও অসহায়ের উপর ক্ষমতার বাহাদুরী ফলায় যে ব্যক্তি, দায়িত্ববান পদটিতে বসে যদি দায়িত্বে অবহেলা করেন তিনি নিজেকে মানুষ পরিচয় দেবেন কিভাবে?

তিনিই প্রকৃত মানুষ যিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংযমী। যার লোভ, লালসা, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংযম রয়েছে। সংযম মানুষের মাঝে নৈতিকতা গড়ে তোলে। লোভ মানুষকে ধ্বংস করে। কামনা, বাসনা, উদরপূর্তির ক্ষেত্রে যে সংযমী সেই মানুষের জীবন হবে শান্তিময়। কারণ মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। যে মানুষ সব কিছু বেশী মাত্রায় ভোগ করে ফেলে তার মাঝে হতাশা এসে যায়। তার জীবন হয়ে পড়ে অসুন্দর। যে মানুষ যত বেশী নিজের আনন্দকে অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে নেয় সে তত বেশী সুখী। শুধুমাত্র ভোগেই নয়— ত্যাগেও আনন্দ লুকায়িত রয়েছে।

গাম্ভীর্যের অপর নামই কি ব্যক্তিত্ব?

লোকটি খুবই ব্যক্তিত্ববান। এ কথাটি যে ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য করে বলা হোক না কেন তাকে আমরা একটু সুনজরে দেখে থাকি। কারণ যাকে আমরা ব্যক্তিত্ববান বলে জানি তার মাঝে এমন কিছু গুণাবলী দেখা যায়। যে গুণাবলী গুলো অপর সব ব্যক্তির মাঝে দেখা যায় না।

এমন অনেকে আছেন যারা রাগী কিংবা দাম্ভিক ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্ববান বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। সঠিক অর্থে একজন মেজাজী লোককে "বদমেজাজী" আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু "বদমেজাজী" লোক তো আর ব্যক্তিত্ববান লোক হতে পারেন না। কারণ একজন মেজাজী লোকের মেজাজ প্রদর্শন অন্য ব্যক্তির গাত্রদাহ সৃষ্টি করে। যে লোকের নিজের স্বকীয়তা, মহানুভবতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংযমী মনোভাব অপরকে আকর্ষিত করতে পারে না। সেই ব্যক্তি কখনও ব্যক্তিত্ববান হতে পারেন না। ব্যক্তিত্ব অতি সূক্ষ্ম গুণাবলী। একজন ব্যক্তির ভালো বৈশিষ্টগুলো যদি অন্য সব ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে তবে ঐ ব্যক্তিকেই আমরা ব্যক্তিত্ববান বলে থাকি।

ব্যক্তিত্ব মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি করে না। সমাজের উপর তলার লোক যদি নীচের তলার লোককে ছোট করে দেখেন গাড়ী বাড়ীও পদমর্যাদা বলে অন্য সব লোক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন তবে তিনি কিছুতেই ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তি হতে পারেন না। নিজেকে রক্ষা করে চলা এক অর্থে খারাপ নয়। কিন্তু তা যদি দাম্ভিকতার সীমানা অতিক্রম করে তবে তা কিছুতেই ব্যক্তিত্ব হতে পারে না।

একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে মূল্যায়ন করবেন। ব্যক্তির সংকীর্ণ মনোভাব যদি অপর ব্যক্তির সুখ শান্তি বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবে তা কখনও ব্যক্তিত্ব বোঝায় না। ব্যক্তিত্ববান মানুষের নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকে। যে ব্যক্তি অপরের কাছে নিজেকে তুলে ধরতে পারেন। অপরের সুখ দুঃখে নিজে শরীক হোন। ধনী, গরীব, উঁচু, নীচু ভেদাভেদ না করেন তিনিই তো উপযুক্ত ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তি। ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তি মাত্রই আত্মবিশ্বাসী।

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা স্ত্রী, সন্তান কিনা ভাইবোনদের সাথে সম্পর্কের

এক দুর্বোধ্য প্রাচীর গড়ে তোলেন। এটা এক ধরনের বাহ্যিক মুখোশ। এরকম লোকেরা ভাবেন তাদেরকে বুঝি সকলেই খুব সমীহ করে চলে। কিন্তু এরা বুঝতেও পারেন না। এদের সাথে পরিবারের অপর ব্যক্তিদের সাথে কি বিস্তর ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়। পরবর্তীতে এদেরকে সবাই এড়িয়ে চলে। এসব লোকদের স্বৈরাচারী মনোভাব ব্যক্তিজীবনে একাকীত্ববোধের সৃষ্টি করে থাকে। অথচ উপযুক্ত ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তি যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে সহজভাবে মানিয়ে নিতে পারেন। অহেতুক নিজের মাঝে বাঁধার প্রাচীর গড়ে তোলেন না। এরা ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, এবং সামাজিক জীবনে কারো ক্ষতির সম্মুখীন হোন না। অতিরিক্ত রাগ কিংবা আবেগ একজন লোকের ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করে দেয়। একজন ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার মতো সাহস রাখেন।

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা পরিবারের অপর ব্যক্তিদের ভয়ে স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারেন না। নিজেকে অন্যের হুকুমের দাসে পরিণত করেন। ধীরে ধীরে একসময় এরা মেরুদণ্ডহীন হয়ে ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেন। আবার কিছু কিছু লোক আছেন এরা নিজের পদমর্যাদাবলে নিজের মর্জি অনুযায়ী সব কাজ করেন। অন্য কোন লোকের মতামতকে কোনরকম তোয়াক্কা করেন না। নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চান। "হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।" এরকম একটি মাত্র লোকের ভুলের কারণে অনেককেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। রূঢ়তা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হতে পারে না। চিৎকার চেঁচামেচি করে সবাইকে দিশেহারা করে তোলাটাই ব্যক্তিত্ব নয়। মানুষ মাত্রেই নিজ নিজ বিবেকের কাছে কমবেশী অপরাধী। নিষ্ঠুর মানুষ তার ব্যক্তি আক্রোশ অপরের উপর ফলিয়ে ব্যক্তিত্ব জাহির করা মানবিকতার লক্ষণ নয়। যে মালিক চাকরের সামান্য অপরাধে তাকে শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। অপরাধীর অপরাধের চাইতেও ব্যক্তিগত আক্রোশ যার বেশী সে ব্যক্তি ব্যক্তিত্বের নামে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় বহন করে যান।

ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্য সাধনার প্রয়োজন। আত্মবিশ্লেষণ ব্যতিত কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। নিজের খারাপ স্বভাবগুলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবর্তন করাই হচ্ছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান শর্ত। তবে মানুষের আত্মমূল্যায়ন বিশ্লেষণের চাইতে আত্মমর্যাদা বিশ্লেষণ করা অধিক জরুরী। নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় মনে করা কিংবা ছোট মনে করা দুটোই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থি। প্রতিটি মানুষই নিজেকে অপর মানুষের চাইতে বড় ভাবতে ভালোবাসে। এটা মানবিক দুর্বলতারই অংশবিশেষ। কিন্তু এ ভাবনাটা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মানুষ উচ্চ আত্মমর্যাদা বোধে ভুগে থাকেন। আবার এমন কিছু লোক আছেন যারা অতি নীচু মর্যাদাবোধে ভুগে থাকেন। এই দুই শ্রেণীর লোকেরাই মানুষের সাথে সহজভাবে মিশতে পারেন না। কারণ পারিবারিক জীবন ও বাইরের জীবন দুটো

একেবারেই আলাদা। পারিবারিক জীবনে আমরা অনেক সময় আমাদের ভালো লাগা কিংবা না লাগাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। কিন্তু বাইরের জীবনে অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলেই নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা কারো উপর চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

আর জোর করে ব্যক্তিত্ববান হওয়া যায় না বলেই রাগ কিংবা গাম্ভীর্যের অপর নাম ব্যক্তিত্ব নয়, সহজ সাবলীলতাই হচ্ছে ব্যক্তিত্ব।

অধিকতর সম্পূর্ণ ও বাস্তব জীবনই সত্য

কল্পনা ও বাস্তব উভয়ের মধ্যে যে একটা বিরোধ কাজ করে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার এ দুটো পর্যায় এক সময় এক সাথে মিলিত হয়ে একটা সত্যে উপনীত হয়ে পড়ে। এ দুয়ের মাঝে যে সমন্বয় সাধন তাই হচ্ছে জীবন। জীবন চলার পথে চলতে গেলে কল্পনা ও বাস্তব পাশাপাশি অবস্থান করে চলে। মানুষ কখনও কল্পনাবিলাসী আবার কখনও বাস্তবমুখী। সব সময়ে যেমন কল্পনার ফানুস ওড়াতে ভালো লাগে না। আবার কঠোর বাস্তবতাও হতাশার সৃষ্টি করে। কেবল মাত্র রক্ত, মাংস হাড়ের সমন্বয় ঘটলেই আমরা কাউকে মানুষ ভাবতে পারি না। মানুষের থাকবে কিছু অনুভূতি, আবেগ, ভালোবাসা।

অনেক সময় আমরা কল্পনাপ্রবণ বলতে অবাস্তবতাকে ভেবে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মানুষই কমবেশী কল্পনাপ্রবণ। কল্পনা মানব মনেরই একটা অনুভূতিপ্রবণ অংশ। কল্পনা আছে বলেই জীবনে বেঁচে থাকা অর্থবহ। যার কল্পনা যতবেশী সূক্ষ্ম ও অনুভূতিপ্রবণ তার কল্পনাও তত গভীর। মানব মনের কল্পনাই পরবর্তীতে বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত হয়। অবশ্য নিছক কল্পনা ও অবাস্তব ধারণা আমরা সচরাচর মেনে নিতে পারি না। যে কল্পনার সাথে বাস্তবতার সমন্বয় ঘটে না সে কল্পনা বাস্তব জীবনে অচল।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কঠোরতা কখনও আমাদের মনে হতাশার জন্ম দেয়। তখনই আমাদের মন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঐমুহূর্তে মন চায় ক্ষণেক শান্তি ও স্বস্তি। আর এই শান্তির জন্যই মানুষ তার অনুভূতিকে সরস রাখতে চায়। সুন্দর অনুভূতিগুলোকে ভুলে থাকার অর্থতো জীবনকে উপেক্ষা করা। আমাদের অন্তর্জগতের সত্যগুলোকে অনুধাবন করতে চাইলে কল্পনার প্রয়োজন। পরবর্তীতে এই কল্পনাই বাস্তব জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের পথ করে দেয়। যে জগতকে আমরা পারি না ছুঁতে অথচ আমাদের অনুভবে যা থাকে তাই তো আমাদের কল্পনার জগত। আমরা প্রতিনিয়ত জীবন সত্যের মুখোমুখি হচ্ছি। এ সত্যকে অনুধাবন করতে চাইলে হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে তা যাচাই করতে হবে। বাইরের জগত থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে নিজের অন্তরের সাথে বোঝাপড়াটাই আমাদেরকে সত্য

চিনিয়ে দেয়।

জগত নিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ যা আমাদের কছে সুন্দর আগামীতে তাই হয়তো বা কুৎসিত। এই যে বাইরের জগতের সাথে অন্তরের জগতের মূল্যবোধের যে দ্বন্দ তা অনুভবের মাধ্যমেই বিশ্লেষণ সম্ভব। এই বিশ্লেষণের পর যা চিরন্তন ও শাশ্বত তাই সুন্দর। জীবন সত্যকে জানতে হলে হৃদয়ের অনুভূতির সাথে বাস্তবতার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। জীবন ও জগতের ভিন্ন ভিন্ন পথ। কিন্তু পথ ভিন্ন হলেও সত্য একটাই। সত্যের মধ্যে কোন প্রকারভেদ নাই। সত্য মানব জীবনের এমন এক অধ্যায় যেখানে কল্পনা ও বাস্তবের মাঝে কোন বিরোধ নেই।

যা সম্পূর্ণ শাশ্বত ও বাস্তব তা জানার পরও মন খোঁজে অবসর। এই অবসর যাপন কিন্তু জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর তৎপরতা নয়। ঘাত প্রতিঘাত নিপীড়ন ও অত্যাচারে মানুষের মন যখন চারপাশের জগৎ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন সেই পিয়াসী মন কিছু সময়ের জন্য বাস্তব জগতের বাইরে গড়ে তোলে কল্পনার জগত। নিজের চারপাশের যা দেখা যায় না। না পাওয়ার ব্যর্থতা। কিংবা আশাহত হৃদয়ে ছোট্ট একটু আশার সন্ধানে মন নিজেকে অন্য জগতে সাজিয়ে নেয়। এ শুধু কল্পনার জগত। যে পথ শুধুমাত্র কন্টকময় যা পাওয়ার আশা করা বৃথা। যে পথে বাস্তবতা অনুপস্থিত। সেটুকুই কল্পনার জগত।

মানুষ লোকালয় ছেড়ে দিয়ে বনে বাদাড়ে যেখানে অনায়াস জীবন যাপন করা সম্ভব সেই আজব দেশের স্বপ্নে কল্পনায় মুখর হতে ভালোবাসে। কিন্তু জীবনের নাগপাশ থেকে কি মানুষ মুক্ত হতে পেরেছে? পেরেছে কি মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে? কিংবা ধুলায় তাজমহল গড়তে?

ভবিষ্যত দ্রষ্টার চোখে আগামীদিনের সম্ভাব্য রূপায়ণ প্রতিফলিত হয়ে কালক্রমে বাস্তবে রূপায়িত হয়। এর মাঝে যা কিছু অন্যায়, অসঙ্গতি, অন্যান্য তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ যে অন্তরের আলোকে পথ চলবে তার বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। জীবন ও জগত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে চাইলে বাস্তবতার বাহ্যিক রূপকে উপেক্ষা করা যায় না।

মানুষের সাধনা মানুষকে আদিম অবস্থা থেকে বর্তমানের উন্নততর পৃথিবীর রূপ দেখিয়েছে। আমাদের পৃথিবীর অর্ধেক বাস্তব ও অর্ধেক স্বপ্ন। এ দুয়ের সমন্বয়ের মাঝেই মানব জীবন রচিত। জীবন শুধু কল্পনা কিংবা শুধু বাস্তবতার সমষ্টি নয়। কল্পনার সৌন্দর্যবোধ মানুষের অন্তরে সাড়া জাগায়। এই দু'য়ের সংঘাতের মাঝেই মানুষ সত্য ও সুন্দরকে বেছে নেয়। জীবন যেখানে অধিকতর সম্পূর্ণ ও বাস্তব সেটাই সত্য।

নির্দয় ও নির্মমতাই বাস্তবতা নয়

প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। একই পারিবারিক পরিবেশে বাস করার পরও বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে। মানুষের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় না এমন কোন মতবাদ, ধর্ম বা সরকার দ্বারা যেমন মানুষকে জয় করা সম্ভব নয়। তেমনি মানুষের মনঃস্তত্বকে কবুল না করে কোন মানুষকে জয় করাও সম্ভব নয়। ভয় দিয়ে হয়তো মানুষকে সাময়িক ভাবে জয় করা সম্ভব। কিন্তু ভয়ের কারণ চলে গেলেই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করা যায় না। ভালোবাসাই একমাত্র শক্তি যা ব্যক্তি জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেই সাথে সুখী ও স্বাধীন মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব। দয়া, মায়া, উদারতা, সততা, সাহস, আনুগত্য, অন্যের ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মূল্যমানের উপর আমরা সবাই কম বেশী গুরুত্বারোপ করে থাকি। সামাজিক সুখ শান্তি এবং ব্যক্তিগত আনন্দ এসব মূল্যমানের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ সবের ভিত্তিতেই সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে। দয়া, উদারতা, অন্যের ধন ও মর্যাদার প্রতি বিশ্বাসী মানুষের প্রয়োজন সব সময়ের জন্যই। এই সকল মানবীয় গুণগুলোর বিকাশ সবার মাঝেই হওয়া উচিত। এই গুণগুলো যদি মানুষের মাঝে বিদ্যমান না থাকে তবে সমাজ তথা পরিবারের নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব নয়। এ গুণগুলো প্রতিটি মানুষের দেখে শেখা উচিত। ব্যক্তিজীবনে প্রতিটি মানুষই যে পিতামাতার আদর্শে গড়ে উঠবে এমন নয়। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত মানুষ প্রতিনিয়তই শিখছে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে। এবং নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা থেকে। বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকেও মানুষ নতুনতর আদর্শের সন্ধান পাচ্ছে। ধীরে ধীরে মানুষ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। মনে রাখতে হবে আমাদের জীবনের সামগ্রিক সমস্যা সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি সচেতন নই। প্রতিটি মানুষেরই সমস্যা ও সংকট অত্যন্ত বাস্তব। তাই তার সাহায্যের জন্য তার কাজের অনুমোদন প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষই অপর মানুষ থেকে ভিন্ন। একজনের উচ্চ মান অপরজনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নাও হতে পারে। তাই প্রতিটি মানুষকে একই মানদন্ডে বিচার করা সক্ষম নয়। একজন মানুষকে জানতে হলে তার অসামর্থ্য কোথায় এবং তার সামর্থ্যের উৎসাহ কি, সে

সম্পর্কে আপনাকে অবহিত হতে হবে। উপযুক্ত পারিবারিক শিক্ষা পরবর্তী জীবনের উপর গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

"বাস্তবতা" অর্থ এই নয় যে, নির্দয়, নির্মম ও দয়াহীন। "মানুষ আমাকে বঞ্চিত করেছে, তাই এ জগতে আমার সাফল্য অনিশ্চিত" কথাটি মনে স্থান দেয়া ঠিক নয়। প্রতিটি মানুষেরই অনুধাবন করতে হবে আমার ভেতরে শক্তি আছে। তাই সাফল্য আমাকে অর্জন করতে হবে। অর্থসংকট মানব জীবনের একটি বড় সংকট। আর্থিক সংকট মানব জীবনকে প্রভাবিত না করে পারে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত কিছু টাকার উপরই নির্ভরশীল। এ রকম ধারণা কোন মানুষের মনে বদ্ধমূল হওয়া ঠিক নয়। কারণ অর্থসর্বস্ব চিন্তাধারার মধ্যে থাকলে সমস্ত প্রাচুর্যের মাঝেও জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

সমস্যা যত সমাধান তত

প্রতিটি মানুষই একে অপরের চাইতে ভিন্ন। পরিস্থিতি মোতাবেক চলাও সকলের এক নয়। কারণ প্রতিটি মানুষেরই শারীরিক, মানসিক পরিবেশ এবং বংশধারা ভিন্ন। আর তাই একজনের জন্য যা সমস্যা মনে হয়। অন্যজন তা সহজেই মেনে নেন। যেসব সমস্যার উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। আমরা কেবল সেসব সমস্যারই সমাধান করতে পারি।

যেমন আমরা ইচ্ছা করলেই নিজের জীবনের পরিবর্তন করতে পারি। নিজের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি মানুষেরই কমবেশী রয়েছে। কিন্তু অপরের জীবনের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। অন্যের ব্যবহারের প্রত্যুত্তরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। কিন্তু নিজের ব্যবহারের প্রত্যুত্তরে অন্যকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব? আর তাই প্রথমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে নিজের সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সমাধান টানতে হবে। নিজের সমস্যার সমাধান নিজে করা সম্ভব। অপরের সমস্যায় নিজের প্রতিক্রিয়াকে পাল্টানো যায় কিন্তু অপর ব্যক্তিকে পাল্টানো সম্ভব নয়।

এই সমস্যাবহুল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে চলতে গেলে চাই নিজের জীবনের সমস্যা খুঁজে বের করা। যে সব কারণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা খুঁজে বের করে প্রাথমিক অবস্থাতেই সমাধান টানা। প্রাথমিক অবস্থায় সমস্যা ধামাচাপা দিলে জীবনের কোন না কোন সময় সে সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সমস্যা যদি প্রকট আকার ধারণ করে তখন সমাধান আরো জটিল হয়ে পড়ে।

সমস্যা সমাধানের জন্য দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই। সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা না করে অনেকেই বছরের পর বছর সমস্যাকে জিইয়ে রাখেন। ধরুন মানুষ যদি নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে থাকে তবে তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় কেউ তা করতে চান না। অসুস্থ হবার পর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে বাধ্য হন।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব হয় যার আশু সমাধান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বাইরের সমস্যা এড়িয়ে গেলেও চলে। কিন্তু ঘরের সমস্যার সমাধান না হলে পারিবারিক বিপর্যয় হতে পারে।

সমস্যার কারণ খুঁজে বের করতে অনেক সময় তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাহায্যের

প্রয়োজন হতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তি এমন হওয়া চাই যেন সহানুভূতিশীল ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

যে কোন সমস্যার সূত্র কি তা অনুসন্ধান করে তা উত্তোরণের চেষ্টা করা ভালো। অনেকে আছেন যারা সমস্যার সূত্র বের না করে বিকল্প পথে সমাধান টানতে চান। এক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান তো হয়ই না। বরং তা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরো বেড়ে যায়। অনুসন্ধানের পরও সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে সমস্যা ঝুলিয়ে না রেখে বিকল্প পথ দেখাই উত্তম।

মানুষের সাধারণ সমস্যাগুলো প্রায়ই একই রকম হয়ে থাকে। তাই সমস্যা সমাধানের জন্য অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য চাওয়া যায়। অন্য লোকের সমাধান পদ্ধতি নিজের জন্য প্রযোজ্য না হলেও অন্তত কিছুটা হলেও সমাধান পাওয়া যায়। যারা আমাদের মতো সমস্যায় পূর্বে ভুগেছিলেন তারা হয়তো আমাদেরকে সমাধানের পথ বাতলে দিতে পারবেন। তবে এতে আমাদেরও সহায়তা থাকতে হবে।

জীবনের যে কোন সমস্যায় সর্বপ্রথম নিজেকে সাহায্য করতে হবে। চুপচাপ বসে থাকলে কোন সমস্যাই আপনা আপনি সমাধান সম্ভব নয়। প্রয়োজনে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বভাব পরিবর্তন করা যেতে পারে। যে কোন কাজে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলাই উত্তম। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে যদি সেই পরিকল্পনা কিছুটা পরিবর্তন করতে হয় তাও করা ভালো।

কিন্তু তাই বলে নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে নয়। আবার পরিকল্পনা মাফিক কাজের পর যদি অগ্রগতি না হয় তবে প্রয়োজনে পরিকল্পনাতে পরিবর্তন আনা যায়।

পরিকল্পনাতে পরিবর্তন আনার মানে এই নয় যে ইচ্ছে হলেই পরিকল্পনা পাল্টে ফেলতে হবে। কারণ যে কোন সফলতার পেছনেই অধ্যবসায় থাকে।

যদি নিজের ভুলের জন্য সমস্যা তৈরি হয়ে থাকে তবে সকল দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সঠিক পথে চলে আসাটাই উত্তম।

যে কোন কাজের ভালো মন্দ দুটো দিক বিচার করে যেটি আমাদের নিকট ভালো মনে হবে। সেই কাজটি করে অপর কাজটি বর্জন করতে হবে।

যে কোন কাজ করতে গেলে কি কি প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে পারি। কার সাহায্য পেতে পারি কে আমাদেরকে বাঁধা দিতে পারে ইত্যাদি ভেবে কাজে এগিয়ে গেলে সমস্যার সৃষ্টি হবে কম।

ব্যর্থতা ও সফলতা

আমাদের স্বভাবের অঙ্গ হলো যখনই আমাদের জীবনে কোন ঝামেলা বা ঝঞ্ঝাট এসে উপস্থিত হয় আমরা তখন অন্যকে দোষারোপ করে থাকি।

নিজের দায়িত্ব নিজে না নিয়ে অন্যের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে অন্যকে দায়ী করতে পারলে অনেকে বেঁচে যান। অনেক সময় এরা নিজেদেরকেও দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তু কিভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে তা বোঝেন না। অপরকে কিংবা নিজেকে দোষারোপ করার মাঝে কোন সমস্যার সমাধান নেই।

যাদের ছেলেবেলা আতংকের মাঝে কেটেছে। কিংবা যে পরিবারের সন্তানরা ছেলেবেলায় অত্যাচারিত হয়েছে এরা বড় হবার পরও শৈশবের ভয়ঙ্কর স্মৃতিকে অবচেতন মনে বহন করে চলে। এভাবে শৈশবের দুর্বিসহ স্মৃতি নিজের অজান্তেই মানুষ বহন করে চলে। পরবর্তী জীবনে তার প্রতিফলন ঘটে থাকে। আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যার জন্য আমরা নিজেরা দায়ী নই। তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে দায়ী করে থাকি। অকারণে যারা নিজেকে দায়ী করে থাকেন তারাও আত্মগ্লানিতে ভুগে থাকেন।

কোন সমস্যায় অন্যকে পুরোপুরি দোষ দেয়া যেমন ঠিক নয়। নিজের উপর দোষ টেনে নেয়াও তেমনি উচিত নয়। আমরা সব সময় নিজেকে যেভাবে নির্দোষ ভেবে থাকি ততটা নির্দোষ আমরা নই। আমাদের অবস্থার জন্য আমরাও অন্তত কিছুটা হলেও দায়ী। আর তাই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে অপরকে পাল্টানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যে কোন অচলাবস্থা হতে বেরিয়ে আসতে চাইলে উচিত নিজেকে পাল্টানো।

আর যদি আমরা মনে করে থাকি এ পরিস্থিতির জন্য আমি দায়ী নই। তবে অন্যের কৃত অপরাধের বোঝা বহন করাও আমাদের উচিত নয়। পরিস্থিতি অনুসারে আমাদের নিজ দায়িত্ব নিজেকেই বহন করা উচিত।

আমাদের জীবনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কতকগুলির জন্য অনেকাংশে আমরা দায়ী নই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আদৌ দায়ী নই। এ ধরনের পরিস্থিতির

শিকার থেকে প্রতিটি মানুষেরই শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে উদ্ধার করা উচিত। যে কারণেই হোক না কেন অতীতে যে ঘটনা ঘটে গেছে। বর্তমানে সে ঘটনাকে টেনে আনার অর্থ হচ্ছে মানসিক শক্তির অপব্যয়। যেসব লোকের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ কম এরাই অতীতকে নিয়ে টানাটানি করে থাকেন। যেমন— "যদি ঐ সময় আমি ভালো পরিবেশ পেতাম তবে জীবনে আরো বড় হতে পারতাম।" এ ধরনের দুঃশ্চিন্তা করে মানসিক শক্তি ক্ষয় করার চাইতে বর্তমানে আমি কি করতে পারি বা পেতে পারি এ ধরনের ইতিবাচক চিন্তা করা উচিত।

যে সকল লোক খুব বেশী আরামপ্রিয় এরা কোন কাজে বেশী দূর এগোতে পারেন না। নিজেদের শক্তির সীমা সম্পর্কে এদের ধারণা নেই। এদের অধিকাংশের জীবনে কোন পরিকল্পনা নেই। থাকলেও অলসতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে শেষ মুহূর্তে হাত দেন। ফলে কাজে বিফল হন। আর বিফল মানুষরাই ব্যর্থতার গ্লানিতে কষ্ট পেয়ে থাকেন। এ প্রকৃতির লোকেরা নিজেকে বোঝার চেষ্টা করেন না। দরকারী কাজের গুরুত্ব এদের কাছে নেই। সময় কখনও বসে থাকে না। তাৎক্ষণিক সুখের মোহ জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। পরে অনুতাপ করে লাভ নেই। এমন অনেকে আছে যারা অল্প পরিশ্রমে ফল লাভ করার জন্য লেখাপড়া অল্প করেই চাকুরী লাভ করতে চান। প্রথম চাকুরীর সুবাদে হাতে টাকা পেলে সকলেই আনন্দিত হয়। পরবর্তী জীবনে কাজের চাপে এবং তাদের সাথে অন্যান্যরা যারা পড়াশোনা করে আরো ভালো কোন চাকুরী লাভ করেন তাদের দেখে ঐ সকল মানুষ হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। জীবন ধারনের জন্য চাকুরী ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়া করাও আর সম্ভব হয় না। এজন্য প্রতিটি মানুষেরই ঠিক করে নেয়া উচিত তার জীবনে কোন্ কাজটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেই অনুযায়ী লক্ষ্যবস্তুতে এগিয়ে যাওয়া ভালো। লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার মুহূর্তটিতে যদি অন্য কোন বস্তু নাও পান তখন ভেবে নিতে হবে ওটা আমার জীবনে প্রয়োজনীয় ছিল না। না পেলে তার জন্য দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

যে কোন কাজে লক্ষ্য স্থির করা সাফল্যের চাবিকাঠি। যদি আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার না থাকে তবে আমাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় মূল্যহীন কাজে। যার মূল্য আমাদের কাছে নিতান্তই কম। পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সন্তানদের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক হওয়া উচিত তার প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ কাজ আমাদেরকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে যে, আমাদের জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পড়ে। মানুষের জীবনের শেষপ্রান্তে পারিবারিক সম্পর্কই অধিক প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তাই জীবনের সূচনাতেই পারিবারিক সম্পর্ক মধুর হওয়া উচিত।

শৈশবের মানসিকতা পরবর্তী জীবনে পরিবর্তিত হওয়া উচিত। নেতিবাচক মনোভাব আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়।

আমাদের জীবনের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সব চিন্তাই অতীত অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে ওঠে। যে সকল ছেলেমেয়েরা অভিভাবকদের ব্যাঙ্গাত্মক এবং তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহারের মাঝে বড় হয় তারা সব সময় নেতিবাচক চিন্তা করতেই শিখে থাকে। ছেলেমেয়েরা অবচেতন মনে অভিভাবকদের এই মন্তব্যগুলো সত্য বলে মেনে নেয়। এই চিন্তাধারা মানুষের মনে অবচেতনে বাসা বাঁধে। পরবর্তী জীবনে এই চিন্তাধারা মানুষ অবচেতনে পোষণ করে চলে। মানুষের জীবনের গতিধারা কোন অটল বস্তু নয় যে একে পাল্টানো যাবে না। আমরা যখন পরিস্থিতিকে জয় করে এগুতে পারি তখনই আমরা নিজেকে সৌভাগ্যবান ভেবে থাকি। আবার ভাগ্য যদি আমাদের প্রতিকূলে থাকে। তখন আমরা নিজেকে দুর্ভাগা ভেবে থাকি।

ভাগ্য আমাদেরকে সৌভাগ্যের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু সৌভাগ্যের শিখরে নিয়ে যায় না। কেউ যদি সৌভাগ্যবশত পৈত্রিক সূত্রে কিছু সম্পদের মালিক হয়ে যায়। সে যদি চেষ্টা করে ঐ ধন সম্পত্তির সে উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে পারবে। সে যদি সম্পত্তির উপযুক্ত ব্যবহার করতে না পারে তবে অল্পদিনেই সে পথের ফকির হয়ে যাবে।

যে কোন কাজের জন্য যদি আমরা প্রস্তুত থাকি তবেই আমরা সৌভাগ্যের সদ্ব্যবহার করতে পারব। যে লোক গাছে উঠতে জানে তাকে সাহায্য করলে সে উঠতে পারবে। আর যার গাছে ওঠার জন্য কোন ইচ্ছা নাই তাকে যতই চাপাচাপি করা হোক না কেন সে উঠতে পারবে না। অনেক সময় আমরা দেখতে পাই একই পরিবারের সন্তান। একই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে একই সুযোগ সুবিধা পেয়েও একজন সফলতা লাভ করেছে অপরজন তা পারছে না। এদের মধ্যে যে সফল হয়েছে সে হয়তো নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতাকে সফল হওয়ার কাজে ব্যয় করেছে। অপরজন হয়তো ভাগ্য আপনা আপনি ফিরবে এটা ভেবে বসে থেকে যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কোন চেষ্টাই করেনি।

আমরা যদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রস্তুত না থাকি। তবে আমরা সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারবো না।

আমরা অনেকেই সাময়িক ব্যর্থতাকে চূড়ান্ত পরাজয় মনে করে মুষড়ে পড়ি। সেই সাথে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি।

আবার আমাদের মাঝে যারা সফল মানুষ তারা ব্যর্থতাকে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে মনে করেন। এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। ব্যর্থতাকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। মানুষ ব্যর্থতা থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অনলস সংগ্রামের মানসিকতা কাজে সফলতা এনে দেয়। ব্যর্থ হয়ে সব কাজ কর্ম বন্ধ করে না দিয়ে ব্যর্থতাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে আরো কঠিনতম সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়া উচিত। যে কোন কাজ বার বার প্র্যাকটিস করলে নিতান্ত আনাড়ী মানুষও পাকাপোক্ত হয়ে

ওঠে। আমরা সকলেই সফলতাকে খুশী মনে গ্রহণ করতে অভ্যস্থ। কিন্তু বিফলতাকে আমরা কেউ গ্রহণ করতে চাই না। কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকার চাইতে বীরের মতো সংগ্রাম করে মরাও অনেক ভালো।

যে কোন ভালো কাজে অগ্রসর হলে মানুষ বিফল হতেই পারে। কিন্তু তাই বলে কাজ বন্ধ করে দিলে মানুষ কখনই সফলতার মুখ দেখবে না। জীবনে ব্যর্থতা আসবেই। এইসব ব্যর্থতাকে তুচ্ছ করেই মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। কষ্টার্জিত সাফল্যের অনুভূতি মানুষের হৃদয়ের গভীরে স্থান পেলে মানুষের আত্মবিশ্বাস অনেকগুণে বেড়ে যায়। ব্যর্থতা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ। জীবনের ভুল ত্রুটি থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রতিটি মানুষেরই নিজেকে পরিবর্তনের মনোভাব থাকা উচিত। অতীতের যে সকল বিষয় আমাদেরকে লক্ষ্যে পৌছুতে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। সে সকল বিষয়গুলো আমাদের মন থেকে পরিবর্তন করে নতুন পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

আমাদের মনের অবচেতনে যে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করে তা আমাদের বর্তমান জীবনকে প্রভাবিত করে। এ ধরনের অজানা কিছু আমাদের মনকে প্রভাবিত করে আমাদের অজান্তেই বর্তমান জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে এসব আজানা সংস্কার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়াই উত্তম।

সৃজনশীলতা, সৌন্দর্য, রুচি ও নতুনত্ব

সাধারণত দৈনন্দিন সমস্যাগুলোকে একটু ভিন্ন চোখে দেখার ক্ষমতা রয়েছে যার সেইতো সৃজনশীল মানুষ। আমাদের প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনকে যে সুন্দরভাবে দেখে, শোনে ও স্পর্শ করতে জানে সেই তো শিল্পী। শিল্পীর দৃষ্টি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক অন্ধকারকে সরিয়ে আলোর পথ দেখায়। শৈল্পিক মন আছে বিধায় আমরা শত যন্ত্রণার মাঝেও জীবনকে ভালোবাসতে জানি।

শিল্পীকে সাধারণত মানুষ একটু পাগলাটে স্বভাবের ভেবে থাকেন। আমরা যত বেশী চিন্তা চেতনায় সুস্থ সবল হবো ততই আমাদের মাঝে শৈল্পিক চেতন লাভ হবে। সমস্যাকে যারা একই চোখে দেখে থাকেন তারা শৈল্পিক মনের হতে পারেন না। যেমন— দেখা যায় অনেক মা-বাবা তাদের সন্তানদের দিনের পর দিন একই কায়দায় শাসন করে যাচ্ছেন। আবার স্ত্রী তার স্বামীকে বিপথ থেকে ফেরাবার জন্য একই কায়দায় ঝগড়া করে যাচ্ছেন।

এইরূপ যারা জগৎকে ভিন্ন চোখে দেখতে ভয় পান। অসাফল্যের জগতে থেকে যান। তারা সৃজনশীল হতে পারেন না। মানুষ যখন তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে অবলোকন করতে পারে। চেনা পরিবেশকে একটু অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে। নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে পরিবেশকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে তারাই হচ্ছেন সৃজনশীল মানুষ। যাদের মাঝে সৃজনশীলতার অভাব রয়েছে এরা নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে জানে না। মানুষ নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে না পেরে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। যেমন ব্যবসার ক্ষেত্রে নিত্য নতুন দ্রব্যসামগ্রী ব্যবসায় উন্নতি আনে। আবার পারিবারিক সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা যদি সবসময় একই পদ্ধতিতে সমাধান আশা করি তবে তা সম্ভব নয়।

যেমন— বিয়ের পূর্বে আমরা যে ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্থ। বিয়ের পরও সে ধরনের জীবন যাপন করলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

আমাদের প্রতিটি মানুষের মাঝে লুকিয়ে আছে একজন বিচারক। যে নাকি সবকিছু বিচার বিবেচনা করতে জানে। লুকিয়ে আছে এক প্রেমিক হৃদয়— যে

ভালোবাসতে জানে। লুকিয়ে আছে একজন শিল্পী হৃদয়। যা আমাদের ক্লান্তিকর জীবন যাপন থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দান করে থাকে।

সফল লোকেরা নিজেদের এই সত্বাকে বিচিত্র পন্থায় প্রকাশ ঘটান। কেউ হয়তো হোন বড় কোন কবি। কেউ হয়তো শিল্পী।

সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটানোর জন্য অসম্ভব রকমের প্রতিভাশীল হওয়ার প্রয়োজন নেই। একটুখানি সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমেই মানুষ তার সৃজনশীল ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম।

যে কোন কাজে আমরা বিভিন্ন পথ অবলম্বন করতে পারি। সর্বক্ষেত্রে প্রথাগত পথেই যে আমাদের সব কাজ হবে এমন নয়। প্রথাগত পথে যদি আমরা সমস্যার সমাধান করতে না পারি। প্রথাবিরোধী পথেও আমরা তা পারি। যে কোন অবস্থার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আমাদেরকে অনুভূতি প্রকাশে সৃজনশীলতা এনে দেয়। ফলে যে কোন কাজে এবং বিভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা সৃজনশীল হতে পারি। আর সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাজে সফলতা এনে দেয়। যেমন— পারিবারিক জীবনে ব্যবসায়িক জীবনে কিংবা যে কোন কাজে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে যদি একটু সুন্দর করি। তবে সহজেই কাজে সফলতা আসে। যেমন— আপনার সন্তানকে প্রত্যহ একই নিয়মে পাঠদান না করে। তাকে অন্য কৌশলে একটু শিক্ষা দিন দেখবেন সে সহজেই সেই পাঠ আয়ত্ব করছে। দম্পতিগণ গতাণুগতিক ভাবে যে যৌনজীবন যাপন করেন। তাতে কিছু নতুন কৌশল আনয়ন করুন। জীবন যাপন পদ্ধতি সুন্দর হবে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়। তাই আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটাই তবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিক্ততা বেড়ে যায়।

যে পরিবারের মানুষজন সব রকমের পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারে সেই পরিবারকে আমরা সুখী পরিবার বলতে পারি।

পারিবারিক সংকটের সময় একে অপরকে দোষারোপ না করে কি কারণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে সেই সমস্যাগুলো বের করে, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যার সমাধান টানা উচিত। নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন আনা যায়। তবে পরিবর্তন যদি ক্ষণে ক্ষণে আসে তবে কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। যে কোন কাজে অধ্যবসায় এবং নমনীয়তা থাকা উচিত। প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের পরিবর্তন করা উচিত।

সৃজনশীল মানুষ যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে অসহায় বোধ না করে নতুন পথ খুঁজে নিতে সচেষ্ট। সব কাজ সর্বক্ষেত্রে একই পদ্ধতিতে করা যায় না। তাই কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। অনেকে আছেন যারা বরাবরই সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এদেরকে বুঝতে হবে সব সময় একই

সিদ্ধান্তে অটলতা সমস্যা বয়ে আনে। সুতরাং সমস্যায় পড়লে অন্যের মতামতকে মেনে নেয়া যায়। তাই পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে পরে নতুন পথে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করাই উত্তম।

এজন্যই সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী হওয়া চাই। সংস্কারমুক্ত মনের লোকেরা যুগের সাথে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারেন। কাজের পথ যদি পরিবর্তন হয় তাতে হতাশ হওয়া ঠিক নয়। কারণ লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে পথ পরিবর্তিত হতে পারে।

মুক্ত মনের মানুষ আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি কখনই উদাসীন থাকতে পারেন না। কারণ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি উদাসীন থাকার অর্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমাগত কুঠারাঘাত করা।

একই পথে বার বার যাতায়াত না করে সব কাজ গুছিয়ে নিয়ে একবারেই সেরে নেয়া যায়। আবার কাজ যদি বেশী মাত্রায় হয়ে যায় তবে তাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে নিলে কাজটি অধিকতর সহজ হয়ে পড়ে।

সৃজনশীলতার সাথে মনের সম্পর্ক খুব নিবিড়। যদি মন নানাধরনের চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে নিজের জন্য কিছু সময় আলাদা করে রাখতে হবে। গতাণুগতিক পথ ছেড়ে একটু অন্য পথে নিজেকে চালিত করলে নিজের অন্তরের মানুষটিকে অবলোকন করা যাবে। তবে লক্ষ্যহীন কাজে অধিক সময় ব্যয় করলে জীবনেরই অপচয় ঘটে।

মানুষ মাত্রেই প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তাই কাজে হাত দেয়ার পূর্বে ভালো মন্দ যাচাই করে প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করে নেয়া ভালো। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যবিহীন কাজ না করাই ভালো। কারণ মাঝপথে এসে কাজ ছেড়ে দিলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। পরবর্তীতে উৎসাহ নষ্ট হতে পারে।

পারস্পরিক সম্পর্ক

পারস্পরিক সম্পর্ককে তৃপ্তিকর করতে গেলে মনের ভাব প্রকাশ করা একান্ত জরুরী। দু'জন মানুষের সম্পর্কের মাঝে যদি কোনরকম উদ্দেশ্য, স্বার্থ কিংবা প্রয়োজন জড়িত না থাকে। তবে সেই সম্পর্কের ধীরে ধীরে অবনতি ঘটে।

অনেক পরিবারে আমরা দেখি স্বামী সারাদিন বাইরে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে বিশ্রাম নিতে চান। এদিকে স্ত্রীর চাওয়া-পাওয়াগুলোর প্রতি স্বামীর নেই কোন ভ্রুক্ষেপ। স্ত্রী ও অভিমান করে নিজের চাওয়া-পাওয়াগুলোর ক্ষেত্রে কোন দাবী করেন না। এভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে না পারাই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। মানুষের সাথে শীতল মনোভাব এটুকুই প্রমাণ করে যে সেই মানুষটির উপর আস্থার অভাব। এভাবে কোন মানুষের সাথে কথাবার্তায় সতর্ক ও আড়ষ্টভাব এটাই প্রমাণিত করে যে লোকটির সাথে কোনরকম সুসম্পর্ক গড়ে না তোলা। আমরা যদি আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কথা মুখে বলতে না পারি তবে অন্যলোকে কি করে আমাদের মনের কথা বুঝবে। কারণ আমরা যেমন আমাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত তেমনি সকলেই নিজেকে নিয়ে সদা ব্যস্ত। কখনও কখনও কেউ কেউ হয়তো সেই প্রয়োজন বুঝে নেয়। কিন্তু না চাইলে মানুষ কি করে একে অপরের মনের ভাষা বুঝে নেবে?

কোন কথা বলার সময় আমরা যখন উৎসাহ বোধ করি তখন আমরা আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে সেই উৎসাহ প্রকাশ করি। অঙ্গভঙ্গির প্রকাশেই বোঝা যায় আমরা কথা বলার মধ্যে কতটা উৎসাহ বোধ করছি। কারো সাথে কথা বলার সময় আড়ষ্ট ভাব। ভাবলেশহীন চেহারা। হাসিখুশীর অভাব। চোখের দিকে দৃষ্টি না দেয়া ইত্যাদি অপর বক্তাকে নিরুৎসাহিত করে তোলে। এ ধরনের লোকের সাথে কথা বলতে কেউ পছন্দ করে না। এদেরকে সবাই এড়িয়ে চলে।

অনেকে আছেন একতরফা ভাবে নিজের বক্তব্যই বলে যান। অন্য কারো বক্তব্যকে কোনরূপ গুরুত্বই দেন না। অনেক সময় এতে অপর পক্ষ বিরক্ত হন।

আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, আমরা অপরের মনের কথা বলতে পারি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ কারো মনের খবর বলতে পারে না। আমরা অন্যের সম্পর্কে

যা ভাবি তা প্রকৃতই আমাদের নিজের মনের কথা। আমরা বড়জোর অনুমান করতে পারি। তাই অনুমানে কাউকে সন্দেহ না করে। মানুষকে সোজাসুজি প্রশ্ন করাই ভালো। অযাচিত বিষয় নিয়ে কখনও তর্কে যাওয়া উচিত নয়।

কারণ মানুষ যখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে তখন ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করে। সেই তর্ক তখন মূল আলোচ্য বিষয় অতিক্রম করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যায়। তখন আসল বিষয় চাপা পড়ে যায়। ব্যক্তিগত মতপার্থক্য বেড়েই চলে।

পারস্পরিক আলোচনায় আমরা যদি ফল পেতে চাই তবে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন না করাই উচিত। এতে করে অপরপক্ষও অনমনীয় হয়ে পড়ে। একসময় তা ব্যক্তিগত সংঘাতে রূপ নেয়।

কথা বলার সময় অপরপক্ষকে বিদ্রুপ কিংবা হেয় করে কথা বলা ঠিক নয়। এতে করে উভয়পক্ষের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

যে বস্তুটি আমরা পেতে চাই তার জন্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় থাকা চাই। মাঝপথে এসে হাল ছেড়ে দিলে। অপরপক্ষ ভাববে আগ্রহের অভাবহেতু যোগাযোগে অনীহা। তাই একসময় সেও হাল ছেড়ে দিবে। এভাবে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

সাধারণত যে সব মানুষ সবসময় মানুষকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে থাকেন। মানুষের কোন কাজেরই মূল্যায়ন করেন না। যে কোন কাজে উৎসাহের পরিবর্তে মানুষকে নিরুৎসাহিত করেন। এসব মানুষের সংস্পর্শে এলে যে কোন মানুষই দমে যেতে বাধ্য। যাদের সংস্পর্শে মানুষের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। এরকম পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষটিও একসময় নেতিবাচক চিন্তা চেতনাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

যে সব শিশুরা ছোটবেলা থেকেই কলহপূর্ণ পরিবেশে বড় হয়ে উঠে। এসব শিশুরা নানা কারণে হতাশ হয়। জীবনে নিরাপত্তাবোধের অভাব বোধ করে থাকে। একসময় ভালো পরিবেশে আসলেও তারা সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এসব শিশুরা বড় হয়ে কলহপ্রবণ হয়ে পড়ে। এদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। কোন কাজেই সফলকাম হতে পারে না। যেসব মানুষ ছোটবেলায় নেতিবাচক চিন্তা চেতনার মানুষদের সাথে বড় হয়েছে। এরা বড় হয়েও এইরূপ লোকদেরকেই পছন্দ করে থাকে। এরা যদি অতীত সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারে তবেই জীবনে উন্নতি সক্ষম।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতা লাভ করতে চাইলে সব কাজেই মনযোগী হওয়া চাই। বৈবাহিক জীবন চাকুরী ব্যবসা এরূপ প্রতিটি বিষয়েই মনযোগ আমাদের সম্পর্কের উন্নয়নের পাশাপাশি কাজের উন্নয়ন লাভে ঘটায়।

স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি মনযোগী না হোন। অথচ সুখী দাম্পত্য জীবন আশা করেন। তবে তা কখনই সম্ভব নয়। আবার যে সকল মা-বাবা তাদের সন্তানদের প্রতি মনযোগী নন। অথচ আশা করেন যে, তাদের সন্তান সুষ্ঠুভাবে

বেড়ে উঠবে। এ ধরনের আশা করা নেহায়েত বোকামী।

যে সব ব্যক্তি বা বিষয় আমাদের নিকট অতি প্রয়োজনীয় এদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। মানুষ যদি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সব সময় সজাগ থাকে তবেই যে কোন কাজে উন্নতি আশা করা যায়। মানুষ যদি সাময়িক আরামের জন্য অলস হয়ে পড়ে তবে জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিফল হয়ে পড়বে। লোকজনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলা হলেই সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। কারুর সাথে যদি সম্পর্কের অবনতি ঘটে নিজের ভু-ল থাকলে তা সংশোধন করা উচিত।

কোন কাজ যদি আমরা ঠিকমতো বুঝতে না পারি তবে সেই কাজের সাথে জড়িত লোকজনকে প্রশ্ন করে জেনে নেয়া ভালো। এভাবে যে কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আমাদের উন্নতিতে সহায়তা করে।

আমরা সাধারণত ভেবে থাকি ব্যর্থ মানুষরাই যে কোন কাজে বার বার চেষ্টা করে সফলতা লাভ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে আমরা এর উল্টোটাই দেখি। ব্যর্থ মানুষরা নিজেদের পুরোনো ধ্যান-ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে এমনভাবে আঁকড়ে থাকেন, যা তাদের পরবর্তী জীবনে কোনরকম পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কাজে সফলতা না পেলে নানা ধরনের অজুহাত খাড়া করেন যেমন— আমার ভাগ্যটাই মন্দ, কিংবা অমুকের দোষে আমি কাজে সফল হতে পারিনি। এ ধরনের নানা অজুহাত খুঁজে বের করেন। সর্বক্ষেত্রেই এরা সবজান্তা মনোভাব পোষণ করে থাকেন। কোন কিছু শেখার আগ্রহও এদের মাঝে নেই।

আর যারা ব্যক্তিজীবনে সফল এরা মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখেন। অজানা বিষয়ের প্রতি এদের যথেষ্ট উৎসাহ থাকে। বিভিন্ন প্রশ্ন করে এরা তাদের অজানা বিষয়গুলো জেনে নেন। যতদিন আমরা বেঁচে থাকি, ততদিনই আমাদের শিখতে হবে। যদি আমরা মনে করে থাকি আমাদের সব কিছু শেখা হয়ে গেছে। কিছুই আর শেখার বাকী নেই। তবে আমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হব। অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সর্বদা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা উচিত। যাদের শেখার আগ্রহ প্রবল তারাই জীবনে সফলতা লাভ করতে সক্ষম। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে সাময়িক ভাবে তৃপ্তি লাভ করা গেলেও পক্ষান্তরে এতে নিজেরই ক্ষতি হয়ে থাকে।

মানুষের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে যদি কেউ নেতিবাচক প্রতিযোগিতায় নামেন অর্থাৎ "আমি জিতব তুমি হারবে।" এ ধরনের মানসিকতা সম্পর্কের উন্নয়নে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিযোগিতা মানুষের জীবনে থাকবেই। প্রতিযোগিতাকে এড়িয়ে কখনও সাফল্য লাভ করা যায় না। প্রতিযোগিতা মানুষের জীবনের বাস্তব সত্য।

আমরা সাধারণত প্রতিযোগিতাকে এড়িয়ে চলি হেরে যাবার ভয়ে। কিংবা অন্যকে হারিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করার জন্য। প্রতিযোগিতায় দু'পক্ষ বিজয়ী হওয়ার

মাঝে আত্মগৌরব লুকিয়ে আছে। বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানুষের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়। প্রতিযোগিতায় উভয়পক্ষ একে অপরকে সাহস ও মনোবল যোগাতে পারে। অপর পক্ষ জিতলে তাকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। অপরের সাফল্যকে নিজের সাফল্য হিসাবে মেনে নেয়া উচিত। অপর পক্ষের সফলতায় অংশীদার হয়ে তার প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা উচিত। এর ফলে একে অপরের ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। একসময় উভয়ের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠে। অপরের প্রতি উদাসীনতা কিংবা সহানুভূতির অভাব মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। অপরের প্রতি সহানুভূতি কিংবা সমবেদনা বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলে। অপরের প্রতি মানুষ যখন সহানুভূতিশীল হয়। তখন মানুষের খারাপ আচরণের পেছনে কি কি কারণ থাকতে পারে সেটা বুঝতে শেখে। অন্যের ছোট খাটো অযৌক্তিক আচরণকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে পারে। কেউ যদি কখনও খারাপ ব্যবহার করে থাকে তবে বুঝে নিতে হবে কোন কারণে তার মেজাজ ভালো নেই। সে তার মনের ভার আরেকজনের উপর ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। এজন্য মনের ভেতরে ক্ষোভ জমা করে রাখা ঠিক নয়।

অন্যের কাছ থেকে আমরা যদি কিছু শিখতে ও জানতে চাই তবে তার প্রতি আগ্রহ থাকা উচিত। অন্যের সমস্যাগুলো নিজের এবং অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। তবেই আমরা তার সমস্যাটুকু বুঝতে পারবো। মানুষ নিজের দোষের কারণেই অপরের কাছ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক মানুষ আছেন যারা সহজে অন্যকে বিশ্বাস করেন না। তাদের মত-বিরুদ্ধ কোন কাজ সহ্য করতে পারেন না। যে কোন মানুষকে তুচ্ছ কারণেই গালমন্দ করেন। অন্যকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে পছন্দ করেন। কোন কাজে সফল হলে নিজের কৃতিত্ব জাহির করেন। বিফল হলে অন্যকে দোষারোপ করে থাকেন। নিজের হুকুম মতো অন্যকে চালাতে পছন্দ করেন।

নিজের ব্যবহারের অজ্ঞতার কারণেই কিছু কিছু মানুষ সহজেই অন্যের শত্রুতে পরিণত হয়। এভাবে অন্যের প্রতি উদাসীনতা পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে। ধীরে ধীরে মানুষ অপরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একঘরে জীবন যাপন করেন।

কেউ যদি কোন কারণে আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে থাকে। তাতে যদি আমাদের কোন দোষ না থাকে। তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরাও প্রত্যুত্তরে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে থাকি। কি কারণে সে আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে তা আমরা তলিয়ে দেখি না। লোকটির মানসিকতা বোঝার কোনরূপ চেষ্টা করি না। এটি হলো একটি কারণ। অপরদিকে কখনও খারাপ ব্যবহার করার পেছনে আমাদেরও কোন ভুল থেকে থাকতে পারে। যা আমরা যাচাই করে দেখি না।

কেউ যদি আমাদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করে থাকে আমরা তার কারণ খুঁজে বের করি না।

মানুষের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে গেলে যে কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল হতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদাসীনতা সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। অন্য লোকের খারাপ আচরণ যদি আমরা সহানুভূতি সহ বিবেচনা করি তবে সম্পর্ক আরো সুন্দর হবে। মনে রাখতে হবে আমরা পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝেই বেঁচে থাকি। এ জগতে আমরা যতই সহানুভূতিশীল হবো ততই আমাদের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে।

সম্পর্কের উন্নয়নে

অপরের সাথে কথা বলার সময় নিজেকে সবজান্তা হিসাবে পরিচয় দেয়া উচিত নয়। নিজের মতামত প্রকাশে দ্বিধাবোধ না করে প্রকাশ করে ফেলাই ভালো। মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে আবেগকে সংযত করতে হবে।

যে সব লোকের সংস্পর্শে গেলে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এদের সংস্পর্শে থাকা উচিত। আর যারা সচরাচর অন্যকে অবদমিত করে রাখে এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাই ভালো।

তবে সব সময় নিজের মত প্রকাশে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়। অন্যের মতামতকেও গুরুত্বসহকারে শোনা উচিত।

জীবনে প্রতিযোগিতা থাকা ভালো। তবে সেই প্রতিযোগিতা যেন অন্যকে অবদমন করার জন্য প্রতিযোগিতা না হয়।

অন্যের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত না হয়ে তাকে উৎসাহিত করা উচিত। ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে অন্যকে যা নয় তাই বলে পরবর্তীতে অনুশোচনা করা ঠিক নয়।

যারা আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি তাদের সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যাতে করে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য মর্যাদাটুকু পেতে পারি।

মানুষের সাথে কথা বলার সময় সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। উৎসাহ নিয়ে কথা বলা উচিত। ব্যবহারে শীতল আচরণ প্রকাশ পাওয়া ঠিক নয়। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে আমাদের আচরণে শীতলতা এসে পড়ে।

প্রতিযোগিতায় হেরে গেলে মুষড়ে না পড়ে বরঞ্চ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সময়টুকুতে শিক্ষণীয় কোন বিষয় থাকলে তা শিখে নেয়া ভালো।

যখন যার সঙ্গে কথা বলি তখন তার সাথে অন্তরঙ্গভাবে কথা বললে অন্যের মতামত এবং অন্যের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা সহজ হয়।

অন্যের সাথে কথা বলার সময় তার কথাবার্তা যদি পছন্দ না হয়। তবে তাকে থামিয়ে দিয়ে সারাক্ষণ নিজের মতামত প্রকাশে ব্যস্ত থাকলে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

প্রতিযোগিতাকে ভয় পেয়ে এড়িয়ে গেলে জীবনে স্থবিরতা আসে আর তাই

যে কোন প্রতিযোগিতায় এটুকু মনে রাখা উচিত যে, উভয়পক্ষেই শক্তি সামর্থ্য আছে। সুতরাং কোন ক্ষেত্রে একপক্ষ এগিয়ে থাকলে অন্যক্ষেত্রে অপরপক্ষ এগিয়ে থাকতেই পারে।

যাদের সংস্পর্শে আসলে উত্তম গুণাবলীগুলোর চর্চা হয় এদের সংস্পর্শে থাকা ভালো। সেজন্য কোন সিদ্ধান্তে যাবার পর কে কি মন্তব্য করল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কাজ এগিয়ে নেয়াটাই উত্তম।

এছাড়া সবসময় নিজের সমস্যা নিয়ে মত্ত থাকলে অপরের সুখ, দুঃখ বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে যায়। নতুন কোন কাজ হাতে নিলে ঐ কাজে অভিজ্ঞ লোকজনের পরামর্শ নেয়া উচিত। অন্যের সমস্যা বুঝতে হলে নিজেকে অন্যের স্থানে কল্পনা করতে হবে।

কেউ যদি কোন পরামর্শ দেন তবে ভাবনা চিন্তা করে সেই পরামর্শ গ্রহণ করা ভালো। তবে অপরের পরামর্শ অনুযায়ী সবসময় কাজ করলে ক্ষতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া বিচিত্র নয়।

পাত্র ভেদে ভালো লাগা মন্দ লাগার অভিরুচি ভিন্ন। অন্যের ভালো লাগা মন্দ লাগার সাথে আমার ভালো লাগা মন্দ লাগার মিল নাও থাকতে পারে। তাই বলে অন্যের ভালো লাগা মন্দ লাগাকে শ্রদ্ধা জানান উচিত। এভাবে ভাবাবেগের মূল্যায়নে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়।

কোন কারণে মানুষ যদি খারাপ আচরণ করেও ফেলে তাৎক্ষণিক ভাবে তার সাথে তদ্রুপ আচরণ না করে যাচাই করা উচিত যে, এখানে আমার কোন ভুল আছে কিনা? কিংবা কোন কারণে মানুষটির মন খারাপ কি না?

কারণ যারা ছোটবেলায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মাঝে বেড়ে ওঠেন এরা নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। একসময় তারাও ঐ ধরনের মানুষই পছন্দ করে থাকেন।

তারপরও অপরের সাথে কথা বলার সময় স্বাছন্দে কথা বলতে হবে। এতে করে মনের কথা পুরোটা খুলে বলা যায়। এভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক যত সুন্দর হবে ততই সম্পর্ক সার্থক করে তোলা সম্ভব।

মনের আয়নায় নিজকে দেখুন

মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই হাঁটতে শেখে না। কথা বলতে শেখে না। এক অসহায় অবস্থার মধ্যে মাতৃক্রোড়ে জন্ম নেয়। ধীরে ধীরে সে উপুড় হয়, বসতে শেখে, হাঁটতে শেখে, একসময় কথা বলতে পারে। এভাবে এক সময় মানুষের করণীয় সবগুলো অংশের কাজই সে শিখে ফেলে। এভাবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে একজন মানুষ আঠারো বছরে সাবালকত্ব লাভ করে।

পরবর্তী জীবনে অনন্ত সংগ্রামের জন্য মানুষ নিজেকে তৈরি করে। বহুমুখী সংগ্রামকে সে বরণ করে নেয়। এই সংগ্রামের পথ ধরে কেউ কেউ সাফল্য লাভ করে থাকেন। কেউবা পারেন না। সাফল্য সবার ক্ষেত্রে এক নয়। অনেকে মনে করে থাকেন জ্ঞানী গুণীজন যেভাবে সাফল্য লাভ করেছেন আমরাও সেভাবে সাফল্য অর্জন করবো। সর্বক্ষেত্রে এ ধারণা করা ঠিক নয়। কারণ সর্ব,যুগে সবার সাফল্য একই ভাবে কামনা করা উচিত নয়।

সাফল্য লাভ একেক জনের নিকট একেক রকম। সাধারণত জীবনের কাম্য বস্তু পাওয়াকেই মানুষ সাফল্য লাভ করা মনে করে থাকে। এই কাম্য বস্তুর রকমভেদ একেক জনের নিকট একেক রকম। যেমন কারো নিকট প্রচুর অর্থবিত্তই হচ্ছে সফলতা। আবার অপর ব্যক্তিই জনপ্রিয়তা অর্জনকেই সফলতা ভেবে থাকেন। ব্যক্তিবিশেষে সফলতার তারতম্য ভিন্ন। আর তাদের সফলতা হচ্ছে নিজের মনের তৃপ্তি।

মানুষের মানসিক গঠন ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিক সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদির সংমিশ্রণেই মানসিক গঠন গড়ে ওঠে।

আর তাই ব্যক্তিভেদে সাফল্য সবার নিকট এক হতে পারে না। আবার বয়স ভেদে মানুষের সফলতা লাভের বিষয় বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন ছাত্রজীবনে একজন কিশোর ভালো ফলাফল লাভ করলেই নিজেকে সফল ভেবে থাকে। কিন্তু একজন মধ্যবয়সী লোক কর্মজীবনে উন্নতি, গাড়ী, বাড়ী ইত্যাদিকে সফলতা ভেবে থাকেন। আবার একজন নারী যখন মধ্যবয়সে আসেন তখন ছেলেমেয়েকে

ভালোভাবে লেখাপড়া করানো দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া গাড়ী বাড়ীর মালিক হওয়ার মাঝে জীবনের সফলতা খোঁজেন।

আবার বৃদ্ধ বয়সে প্রতিটি মানুষই শান্তিপূর্ণ জীবন খুঁজে বেড়ান। একজন বৃদ্ধ তখনই নিজেকে সফল ভাবতে পারেন যখন তিনি নিজ সন্তান-সন্ততিকে জীবনে সফল হতে দেখেন।

বিভিন্ন পরিবারের সফলতার মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন। দেখা যায়, যে পরিবারের কোন কাজ অনেক বড় অন্য পরিবারেই তা অসম্মানজনক কাজ। যেমন— কোন কোন পরিবারের সদস্যরা অভিনয় জগতে সাফল্য লাভ করলে তাতে গর্ববোধ করে থাকেন। অপরপক্ষে কোন ধার্মিক পরিবারের সদস্যরা অভিনয় করাকে অপছন্দ করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতা মাতা ও সন্তানের ইচ্ছা অনিচ্ছার মধ্যে সংঘাত বেঁধে যায়। বাবা-মা চান সন্তানকে লেখাপড়ায় সর্বেসর্বা করে তুলতে। অপরদিকে সন্তান হয়তো লেখাপড়ার পাশাপাশি গানবাজনাও পছন্দ করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা সন্তানের উপর বলপ্রয়োগ করে থাকেন। এতে সন্তানের মনে বিদ্বেষ গড়ে উঠে। অনেক মা-বাবা জন্মের শুরুতেই সন্তানকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে দেন। সন্তান তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মেনে নিলে তাদের বাহ্‌বা দিতে থাকেন। মেনে নিতে না পারলে অহরহ তাদেরকে ভৎর্সনা করে থাকেন।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পিতামাতা তার নিজের জীবনের অপূর্ণ আশা সন্তানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। যে পিতা নিজে জীবনে শিক্ষিত হতে পারেন নি তিনি সন্তানকে শিক্ষিত করে তোলেন। যে মায়ের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তিনি তার মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দিতে রাজী নন। আবার যেসব মা-বাবা ছেলেবেলায় অভাবের মাঝে দিন কাটিয়েছেন তারা সন্তানদের অভাব সহ্য করেত পারেন না। একই পরিবারের ভাইবোন ও আত্মীয়জনরাও নিজেদের মধ্যে গাড়ী বাড়ী নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। মানুষ নিজেই নিজের সাফল্যের মানদন্ড যাচাই করতে পারেন। তবে যে কোন কাজেই সাফল্য অর্জনের জন্য চাই অবাধ স্বাধীনতা। যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করা চাই। সেই সাথে কাজের স্বীকৃতিও থাকা চাই। যে কাজ করে আপনি আনন্দ পাবেন তাই আপনার সফল কাজ। অনেক সফল ব্যক্তি আছেন যারা নিজের সফলতার পেছনে প্রথমেই ভাগ্যকে স্বীকার করে আনন্দ পান। তেমনি দুর্ভাগ্যের জন্যও ভাগ্যকে দায়ী করে থাকেন। ভাগ্য হয়তো মানুষের সফলতার সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু মানুষকেও সেই সুযোগ গ্রহণ করতে হয়। অলস ব্যক্তি যদি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকেন তবে তার ভাগ্যেরচাকা কোনদিনও ঘুরবে না।

এমন অনেকে আছেন যারা মনে করেন জীবনে বড় হতে গেলে একাডেমীক শিক্ষার প্রয়োজন খুব বেশী। কথাটি পুরোপুরি সত্য নয়। মানুষের জীবনে

একাডেমীক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু তাই বলে সাফল্য লাভের জন্য এবং আত্মতৃপ্তির জন্য এই শিক্ষার খুব বেশী আবশ্যকতা নেই।

এ জন্য উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি সাফল্যের শিখরে আরোহন করতে পারেন। এ কথাটি যেমন আদৌ সত্য নয়। তেমনি উচ্চশিক্ষা লাভ না করেও সফলতার শীর্ষে আরোহন করেছেন এমন নজীরও কম নয়। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন। যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে কেবল মাত্র অর্থ এবং সামর্থ্যের অপব্যয় ঘটিয়ে থাকেন। ব্যক্তি জীবনে এদেরকে সফল হতে খুব কমই দেখা যায়। যাই হোক, এর অর্থ এই নয় যে মানুষের জীবনে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নেই। শিক্ষা মানব জীবনে খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তা যেন প্রথাগত শিক্ষার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে না যায়। কবির ভাষায় "বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র।" উক্তিটি ব্যক্তি অভিজ্ঞতার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

প্রখর বুদ্ধিই যে মানুষকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে এ কথাটি অনেকাংশে ঠিক নয়।

যারা সব কিছু বেশী মাত্রায় বুঝে যায় তারা অনেক ক্ষেত্রে পরিশ্রম করতে অপারগ। বুদ্ধিমান লোক অতি সহজেই সব কিছু বুঝে ফেলেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে বিনা পরিশ্রমেই সব কিছু লাভ করতে চান। অনেক মা-বাবাই আছেন যারা তাদের সবচাইতে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান সন্তানের কাছে অনেক কিছুই আশা করে থাকেন। পরবর্তীতে তা না পেলে তারা হতাশ হয়ে পড়েন।

একই পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও দেখা যায় কেউ সফল হচ্ছেন। আবার কেউ হয়তো সফল হন না। অনেকে মনে করে থাকেন আমার জন্ম যেহেতু ভালো ও সফল পরিবারে তাই আমি জীবনে সফল হবই। কথাটি ঠিক নয়। অনেক ভালো পরিবারের সন্তানকেও দেখা যাচ্ছে সমাজ বিরোধী অনেক কর্মকান্ডে লিপ্ত। এসব সন্তানরা মনে করে থাকে এদের পরিবারের লোকজন বংশ পরম্পরায় সফল হয়ে আসছেন। এদের কোন ভুল ত্রুটি নেই। এতে করে এদের সন্তানরা সংগ্রামী মনোভাব হারিয়ে ফেলে। ফলে এদের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়ে পড়ে।

প্রচুর ধন সম্পদের মাঝে থেকেও অনেক মানুষ সফলতা লাভে সক্ষম নন। ধন সম্পত্তি মানুষের জীবনের প্রয়োজন মেটায় সত্য। তবে অধিক ধন সম্পদের মাঝে থাকলেও মানুষ তার কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলে। না চাইতেই হাতের নাগালে টাকা পয়সা থাকলে মানুষ কষ্ট করে উপার্জন করতে নারাজ। একজন লোক তখনই সফলতা লাভ করবেন যখন তিনি ভাবেন তিনি নিজে কি? এবং নিজের জীবনে তিনি কি করেছেন? নিজেকে কতটুকু মূল্যায়ন করতে পেরেছেন?

নিজের মনের আয়নায় নিজেকে দেখুন? নিজের ইচ্ছে, অনিচ্ছে কাজ কর্ম ইত্যাদির মূল্য কতটুকু আপনার কাছে?

পারিবারিক, বন্ধুত্বপূর্ণ ও সামাজিক সম্পর্কের অর্থ উপার্জন ও পেশার মধ্যে আপনি কতটুকু সৎ? যদি সৎ নাও থাকেন তবে কি আপনি সৎ হতে চান? মানুষের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়তে চান? পারিবারিক সম্পর্কের মাঝে নিজেকে পরিপূর্ণ দেখতে চান? নিজের সাথে মিথ্যাচার করবেন না। তবেই অন্তরের তৃপ্তি লাভ করতে পারবেন। কারণ কোন সাফল্যই রাতারাতি লাভ করা সম্ভব নয়। ধৈর্য্য ধরুন এবং এগিয়ে চলুন। লক্ষ্য হওয়া চাই বাস্তবসম্মত। অবাস্তব লক্ষ্য কিংবা অগ্রগতি খুব ধীরে হলেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে থাকে।

জীবনের অগ্রগতি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না। প্রতিটি মানুষের জীবনেই বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন— ব্যক্তিগত, পারিবারিকও, সামাজিক। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে সফলতা লাভে সক্ষম এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। জীবনের এক অংশ সফল হলেও অন্য অংশ ব্যর্থ হতে পারে। তাই সর্বদিকেই পূর্বাপর বিচার বিবেচনা করে নিলে জীবন অধিকতর সুন্দর হবে।

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকুর প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে একজনের জীবনে যার গুরুত্ব বেশী অপরজনের জীবনে তার গুরুত্ব হয়তো বা কম। কিংবা জীবনের এক এক পর্বে এক এক দিক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং জীবনের গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ এগিয়ে নিলে জীবনে উন্নতি লাভ সম্ভব।

প্রচুর ধন দৌলত লাভের আশায় প্রিয়জনরা বঞ্চিত হন। প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভে হয়তো জীবনের একদিক সফল হয়। অন্য অংশ বঞ্চিত থেকে যায়। তাই জীবনের বিভিন্ন অংশের সফলতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সবার কাম্য হওয়া উচিত।

জন্মেই তো আর মানুষ উন্নতির শিখরে উঠতে পারে না। তাই জীবনে সফল হতে গেলে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যাওয়াই উত্তম। যে কোন জিনিস সহজে পাওয়া গেলে মানুষ তার মূল্য বোঝে না। এতে আত্ম গরিমা বেড়ে যায়। আরো বেশী কিছু পাওয়ার লোভ জাগে মনে। মাঝ পথে এসে হোঁচট খেলে পরে অতি আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে মনে। জীবনে জাগে হতাশা। যে কোন কাজে অতি দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার চাইতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলাই উত্তম।

যে কোন সফলতা অর্জনের জন্য আমরা যে নিরন্তর সংগ্রাম করছি তাতেই আমাদের প্রকৃত আনন্দ। মানসিক তৃপ্তি অতি ক্ষণস্থায়ী। তাই কোন আকাংখিত কিছু পেয়ে যাবার পরে যে সুখটুকু আমরা পেয়ে থাকি। তার চেয়ে তা লাভ করার সাধনাতেই আমাদের অধিক সুখ। তাই মানুষের জীবনে পর পর কয়েকটি লক্ষ্য নির্ধারিত থাকা উচিত। একটি লাভ করার পর যাতে আরেকটি লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যায়। নতুবা মনে হতাশার জন্ম নেয়। কারণ উন্নতির শিখরে আরোহন করেও এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা হতাশায় নিরন্তর ভুগে থাকেন।

বাস্তবতা বিবর্জিত লক্ষ্যও শুধু হতাশা বাড়ায়। তাই বাস্তব অবস্থার সাথে

সঙ্গতি না থাকলে লক্ষ্যের পথ পরিবর্তন করা ভালো। প্রয়োজনে লক্ষ্যও কিছুটা পরিবর্তন করা যেতে পারে। যে কোন মূল্যে যারা সফলতা চান। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, যা মানুষের জীবনে শান্তি আনয়ন করে। তার বিনিময়ে সফলতা লাভ করে সাময়িক ভাবে বিজিত হলেও মনে হতাশার জন্ম নেয়। ব্যক্তিগত জীবনে নানা ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে যারা উপরে উঠেন। তারা হয়তো সাময়িকভাবে জয়ী হোন। কিন্তু তার এই স্বার্থকেন্দ্রিক স্বভাব তাকে একসময় একাকীত্বের অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মিথ্যাচার এবং প্রবঞ্চনা মানুষের মনে আনে তীব্র অনুশোচনা।

দামী গাড়ী-বাড়ী কিংবা প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিই যে জীবনে উপযুক্ত সফলতা লাভ করতে পেরেছেন তা কিন্তু নয়। বাইরে থেকে সফল মনে হলেও আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের অনেকেই সফল নন। মানুষের মনের শান্তি এবং অন্তরের সফলতাই হচ্ছে মূল। মানুষ নিজে কোন কাজ করে মনে আনন্দ পেলে সেটাই তার সফলতা। কারণ আপনি যে পেশায় নিয়োজিত অন্যের নিকট সে পেশা হয়তো ততটা ভালো লাগতে নাও পারে। তাই আপনার ভালোবাসা আপনরাই।

আমরা যদি অন্তরে প্রকৃত সুখ অনুভব করতে পারি। তখনই আমরা সফল। বস্তুগত সুখ সব সময় সফলতা আনতে সক্ষম নয়। আমাদের বাহ্যিক সফলতার সাথে অন্তরের যোগসূত্র ঘটলেই আমরা সফল।

জীবনে সুখ লাভ করতে চাইলে আমাদের জীবনের সবচাইতে প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিংবা ব্যক্তিকে সময় দিতে হবে। জীবনের পূর্বের অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় নিজেকে কতটুকু পরিবর্তন করতে পেরেছি তা যাচাই করে দেখা উচিত। যদি বার বার ব্যর্থতা আসে তবে কেন তা হচ্ছে তা ভেবে নিয়েই কাজে এগুনো ভালো। জীবনে যে সকল কাজে আমরা সফল হয়েছি তা স্মরণ রাখতে হবে। যখনই কোন কাজে ব্যর্থতা আসবে সফলতার সুন্দর দিনগুলো স্মরণ করতে হবে।

আত্মীয় পরিজনদের সাথে ব্যবহারে উন্নত হোন। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সাহাচার্য দিন। একে অপরের কথা মন দিয়ে শুনুন এবং সহানুভূতির সাথে তা বুঝতে চেষ্টা করুন।

সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা ঠিক নয়। তবে পারিবারিক তালগোলের মধ্যে না যাওয়াই উত্তম। পরিবারের কোন সদস্য যদি অপরাপর সদস্যদের বিরুদ্ধে কাউকে উত্তেজিত করে তোলে। তবে তাদের কথায় কান দেয়া ঠিক নয়। বন্ধু-বান্ধবকে মাঝে মধ্যে সময় দিলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না। সেই সাথে সন্তান-সন্ততিকে সময় দিলে, তাদেরকে ভালো কাজে উৎসাহ দিলে, তাদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলে, সন্তানদের সাথে অন্যায়ভাবে কঠোর আচরণ না করে প্রয়োজনে দৃঢ় হলে তাদের জীবনে মঙ্গল বয়ে আসবে।

কর্মজীবনে পেশাগত যোগ্যতা বাড়াতে চাইলে সেই লাইনে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া উচিত। জনসম্পর্কের উন্নতির জন্য কিছু জনহিতকর কাজ করা উচিত।

বৃদ্ধবয়সে যাতে জীবন যাত্রার মান ঠিক থাকে তাই পেশাগত জীবনে কিছু সঞ্চয় করা ভালো। কিংবা পেশাগত যোগ্যতার পাশাপাশি অন্য কোন কাজে অংশগ্রহণ করলে বিকল্প রাস্তা খোলা থাকে। ব্যক্তিজীবনে যাতে মনের শান্তি বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে মনের শান্তি নষ্ট করা ঠিক না। জীবন সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া এবং ইতিবাচক চিন্তা করা উচিত।

নিজের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। মাঝে মধ্যে বিনোদনে অংশগ্রহণ করা সেই সাথে দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

পরিবর্তন জীবনকে অধিকতর সুন্দর করে

জীবন আনন্দময় হয়ে উঠুক এটুকু আশা আমরা সকলেই করে থাকি। কিন্তু জীবনকে নমনীয় ও পরিবর্তনশীল করতে চাইলে মনকে প্রাধান্য দিতে হবে। সেজন্য চাই মনের প্রস্তুতি। মনকে সতত অভ্যাসের কারাগারে বন্দী করে রাখা ঠিক নয়। জীবনে কিছু প্রথা থাকে যা সব সময় মেনে চলা সম্ভব নয়। এ প্রথা মোতাবেক চলতে গেলে মনকে অভ্যাসের দাসে পরিণত করা হবে। মনের মুক্তি কোনভাবেই তখন আর সম্ভব হবে না। জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন আমরা পরনির্ভরতার শেকল ছিঁড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। স্বাধীন হতে চাই। তারপরেও আমরা কেউ কেউ অন্যের উপর নির্ভর করে চলতে ভালোবাসি। আমরা কেউ পরিপূর্ণ স্বাধীন নই। সকলেই একে অপরের উপর কম বেশী নির্ভরশীল। তা না হলে আমরা একাকী হয়ে পড়বো। কিন্তু তাই বলে প্রতিটি কাজেই অপরের উপর নির্ভরশীল হওয়া ঠিক নয়। মানুষ যে দৃষ্টিতে তার আশপাশের জগতকে দেখে তার পরিবর্তন সম্ভব। আজ যিনি পরিস্থিতির শিকার, কালই তিনি পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণকর্তা। মানসিক জড়তা বা সংকোচের জন্য আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি না। প্রয়োজনীয় বিষয় অজ্ঞ থেকে অন্যকে দোষারোপ করার মাঝে আত্মগৌরব নেই। যখনই আমরা বুঝতে পারবো নিজের জীবনকে আমরা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তখনই নিজের সিদ্ধান্ত আমরা নিজেরাই নিতে পারি। মানুষের মন সদা পরিবর্তনশীল। জীবনে পরিবর্তন না এলে সভ্যতা থেমে যেত। পরিবর্তন কখনও থেমে থাকে না। আজ আমরা যে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি দশ বছর পর সে পথ দিয়ে হাঁটলে জীবনের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। মানুষ তার নিজের জীবনের কিছু অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের সাথে যন্ত্রণাও জড়ানো থাকে। উন্নতি বা পরিবর্তনের সাথে যন্ত্রণাও থাকবে। সেই যন্ত্রণা হাসিমুখে মেনে নেবার ক্ষমতা থাকতে হবে। "এড়িয়ে তারে পালাস না রে, ধরা দিতে হ'সনে কাতর।" লক্ষ্যে পৌঁছার আনন্দে সফল যন্ত্রণা তুচ্ছ হয়ে যাবে। সকল কাঁটা ধন্য করে সাফল্যের ফুল ফুটবেই। আর এজন্য যে কোন পরিস্থিতিতে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা চাই।

নিজের অপারগতার জন্য অপরকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। অনেকে পাছে লোকে বোকা ভাবে কিংবা শেখার কোন আন্তরিক ইচ্ছা না থাকার জন্য অন্যের কাছ থেকে কিছু শিখতে ভয় পায়। জড়তা সংকোচের জন্য অনেক বিষয়ে আমরা অজ্ঞ থেকে যাই। কারো সাথে কথা বলার পূর্বেই প্রশ্ন করে জেনে নেয়া উচিত আমার সাথে কথা বলতে সে বিরক্ত বোধ করছে না তো? কিংবা কথা বলার মতো তার পর্যাপ্ত সময় আছে কি না? সাধারণত কারো কাছে কোন কিছু জানতে চাইলে যার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে সে নিজের জ্ঞান অন্যকে বিতরণ করতে পেরে খুশীই হয়ে থাকে।

তাই আন্তরিকতার সাথে কারো কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়টুকু জেনে নেয়াই ভালো। ধরুন কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় সেই প্রতিষ্ঠানের উপরওয়ালার কাছ থেকে কোন প্রশ্ন জানা না থাকলে জেনে নিলে কাজ অনেক সহজ হয়।

ধরুন, কেউ যদি খারাপ ব্যবহার করে তবে কেন সে খারাপ ব্যবহার করল এটুকু প্রশ্ন করে জেনে নিলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে। আবার কাউকে প্রশ্ন করতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়ারও সম্ভাবনা থাকতে পারে। কেউ হয়তো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী নন। কিংবা লোকটি হয়তো সেই ব্যাপারে অজ্ঞ। কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করতে নারাজ। তাই উত্তর দাতার কাছ থেকে সবচাইতে খারাপ উত্তর শোনার জন্য মনকে প্রস্তুত রাখা উচিত। বই পড়েও আমরা আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারি।

এমন অনেক মানুষ আছেন যারা অন্যের কাছ থেকে কোন কিছু শিখতে নারাজ। এমনকি পড়াশোনার ধারে কাছেও যান না। অথচ নিজেকে সবজান্তা মনে করে থাকেন। নিজের অজ্ঞতাকে মূলধন করে আদর্শ হতে চান। না জানাটা কোন অপরাধ নয়। এটুকু সহজভাবে অনেকে মেনে নেন না। যার ফলে মানুষ নিজেকেও জানতে পারে না। মানুষ নিজে কি? সে সম্পর্কেও অজ্ঞ থেকে যান। এর উত্তরে একটি কারণ হলো মানুষ সত্যকে জানতে ভয় পায়। অনেকে খোঁজ খবর নেয়ার চাইতে না নেয়াটাকেই নিরাপদ ভেবে থাকেন। অজ্ঞতাকেই উত্তম মনে করেন। সব কিছু জেনে নেয়ার আতঙ্কে ভোগেন। কোন মানুষ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কিনা এটুকু অনেকেই ভেবে না দেখে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে ফেলেন।

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে কোন সুযোগ হাতের কাছে পেলে অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে বাস্তবকে উপেক্ষা করেই এগিয়ে যান।

সাধারণত অপরের উপর নির্ভরশীলতার কারণেই আমরা কোন কিছু শিখতে নারাজ। অপরে করে দেবে এই মনোভাবের জন্য আমাদের অনেক কিছু শেখা সম্ভব নয়। বাস্তবিক পক্ষে অতি নির্ভরশীল মানুষ কেউ পছন্দ করেন না। স্বনির্ভরশীল মানুষ সকলেরই পছন্দনীয়। কোন একটি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে গেলে

প্রতিটি বিষয় নখদর্পণে থাকা উচিত। প্রতিটি বিষয়ে সচেতন থাকলেই অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

অগোছালো ব্যক্তি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কারোই প্রিয়পাত্র হতে পারেন না। অগোছালো ব্যক্তির সঙ্গে কোন কাজ করতে গেলে যে কোন কাজে দেরী হয়ে যায়। প্রস্তুতির অভাবে পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় চটপটে এবং বুদ্ধিমান লোকও অগোছালো স্বভাবের জন্য উন্নতি করতে পারেন না। যারা কাজের জন্য অপ্রস্তুত কিংবা সব কাজেই দেরী করে ফেলেন। এসব লোকেরা নিজের কাজের জন্য সর্বদা অন্যকে দোষারোপ করে থাকেন। এই মানসিকতা তাদের নিজেরও যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে।

জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার অভাবে জীবনের প্রতি নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যায়। যে কোন কাজে সময় পার হয়ে যায়। যে মানুষ নিজের জীবন সম্বন্ধে উদাসীন। যার জীবনের কোন পরিকল্পনা নাই। সেই মানুষ নিজেই নিজের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ।

দীর্ঘকাল যাবত শুধু পরিকল্পনা করলাম, পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলাম কিন্তু কোন কার্যকর সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। তবে সেই পরিকল্পনা কখনও বাস্তবায়িত হতে পারে না।

কিছু কিছু মানুষকে দেখা যায় সুযোগের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল বসে থাকেন। অনেক সুবর্ণ সুযোগ হাতের নাগালে এসেও চলে যায়। কিন্তু সেই সুযোগ তারা কাজে লাগাতে পারেন না। উপযুক্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দোটানা মনোভাব কিংবা অন্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতাই এর একমাত্র কারণ।

যে সকল মা-বাবা ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের সকল দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন। কিংবা অতিরিক্ত শাসনের মাঝে মানুষ করেন। এরা বড় হয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। ছোটবেলায় কোন ভুল সিদ্ধান্তের জন্য এদেরকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হতো। যার জন্য বড় হয়েও কোন সিদ্ধান্ত নেবার পর এরা দুশ্চিন্তায় জর্জরিত থাকেন। যার উপর এরা নির্ভরশীল তাকে না পেলে চোখে অন্ধকার দেখেন।

যারা জীবনে সফলতা লাভ করতে চান তারা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি বিষয়ের উপরই সজাগ দৃষ্টি রাখেন। প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা ভালো তবে প্রতিটি কাজ নিজ হাতে করতে গেলে সময়েরই অপব্যবহার হয়। প্রয়োজনীয় কাজটি করা হয় না। যে কাজ অন্যকে দিয়ে করানো যায় সে কাজে সময়ের অযথা অপব্যয় না করে প্রয়োজনীয় কাজে মনোযোগী হওয়া উচিত। অন্য লোক যদি দৈনন্দিন খুটিনাটি কাজগুলো উৎসাহভরে করতে পারে। তবে তাদেরকে দিয়ে করানোই ভালো। সব কাজের কাজি হওয়ার চাইতে কে কোন্ কাজটি ভালো ভাবে করতে পারবে সেই

দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত।

যে কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন ব্যক্তি যদি কাজে কর্মে নিখুঁতও হোন। তারপরেও সব কাজ স্বহস্তে করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি করে ফেলেন। অথচ অপরের সাথে কাজগুলো ভাগাভাগি করে নিলে সময়ের অপচয় রোধ করা যায়। কাজেও সাহায্য হয়।

শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাগাভাগি করে নিলে দায়িত্ববোধ সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। একের প্রতি অন্যের একাত্মতা বাড়ে। যে পরিবারে মাতাপিতা সন্তানদেরকে শৈশব থেকেই কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন সেইসব সন্তানরা ছোটবেলা থেকেই দায়িত্ববান ও স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এদের কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। দায়িত্ব ভাগ করে দিলে বাবা মায়েরও কাজের চাপ কমে এবং উদ্বৃত্ত সময়টুকু পারিবারিক বিনোদনেও ব্যয় করা যায়। ধীরে ধীরে পরিবারের মাঝে আনন্দময় পরিবেশ গড়ে ওঠে। দায়িত্ববোধ বাড়ার পাশাপাশি একের প্রতি অন্যের মমতা ও বৃদ্ধি পায়।

একথা সকলের মনে রাখা উচিত যে, যে কোন কাজে সফলতা পেতে গেলে সময় ও শক্তি দুইয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় শক্তি ব্যয় করা উচিত নয়। এমন অনেক লোক আছেন যারা টাকা রোজগারের দিকে এতই নিমগ্ন থাকেন যে, নিজের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পান না। আমাদের সব সময় লক্ষ্য রাখা উচিত আমরা যে কাজে সময় ব্যয় করছি তা কি আমাদেরকে লক্ষ্য থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে কি না?

অত্যধিক আবেগপ্রবণ মানুষ কখনও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করতে পারেন না। আজ কোন কাজে অংশগ্রহণ করলেন, দেখা গেল কিছুদিন পর আরেকটি কাজে যোগ দিলেন। আজ দেখা গেল যার সাথে গলায় গলায় বন্ধুত্ব, কিছুদিনের মধ্যেই তার সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট করে অন্য আরেকজনের সাথে বন্ধুত্বে মেতে উঠেছেন। এ ধরনের লোক যে কাজ শুরু করেন সে কাজ বিপুল উৎসাহ নিয়ে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে যায় এরা সহজেই যে কোন মানুষের প্রেমে পড়েন। সেই প্রেম নষ্ট হতেও বেশী সময় লাগে না।

এসব মানুষের নতুন কিছু শেখার ক্ষমতা হ্রাস পায়। জীবনের প্রতিটি দিকই সমস্যা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এদের মন সর্বদা এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত থাকে। এরা অনেকগুলো কাজ একসঙ্গে হাতে নেয়। কিন্তু কোন কাজই সম্পন্ন করতে সক্ষম হন না। এদের জীবনের সঠিক লক্ষ্য কি? এরা নিজেরাই তা জানেন না। লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে যে সব কিছু আয়ত্বে থাকা চাই এরা তা বুঝতে চান না। হঠাৎ আবেগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে যে কোন কাজ শুরু করে দেন। ধরুন কোন একজন ব্যক্তির মাথায় চিন্তা এলো তিনি ব্যবসা করবেন। দেখা গেল যে ব্যবসা

তিনি করতে যাচ্ছেন তার বাজারে চাহিদা কেমন। লাভ কেমন হবে। কতটুকু পুঁজি খাটানো দরকার কিছুই চিন্তাভাবনা না করে মোটা অঙ্কের টাকা ধারদেনা করে ব্যবসায় লোকসান করে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন।

কোন কাজই এরা নিষ্ঠা সহকারে করতে পারেন না। অবশ্য কাজে পরিপূর্ণ মনোযোগ সব সময় সম্ভব নয়। কোন একটি কাজে পরিপূর্ণ মনোযোগ ঢেলে দিলে অন্য সব কাজে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়। তবে যখন আমরা যে কাজ করে থাকি সে কাজে মনোযোগী হওয়া উচিত। আবার যে কোন একটি কাজের প্রতি অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়া উচিত নয়। যে কোন কাজে অবিচল দৃঢ়তা, ইচ্ছাশক্তি এবং উৎসাহ কাজের প্রতি একাত্মতা বাড়ায়। জীবনে যদি বৈচিত্র্য, আত্মতৃপ্তি এবং সাফল্য না থাকে সে জীবন হয়ে পড়ে ধূসর মরুভূমির মতো। জীবনে সফলতা পেতে চাইলে অন্তত কিছুটা হলেও ঝুঁকি নিতে হয়। তবে সেই ঝুঁকি যেন নাগালের মধ্যে থাকে। ঝুঁকি যদি নাগালের বাইরে হয় তবে সেই ঝুঁকি নেয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়।

মানুষ ঝুঁকি নিতে ভয় পায় অতীতের কোন ব্যর্থতার স্মৃতি কিংবা গতানুগতিক জীবন ছেড়ে চলে যাবার অনিচ্ছার জন্য। অথচ আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের অজ্ঞাতে অনেক ঝুঁকি নিয়ে থাকি। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে জেনেও আমরা রাস্তায় বের হই। মৃদুমন্থর পথে এগিয়ে গেলে সর্বক্ষেত্রে সফলতা আসে না। মাঝে মধ্যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীনও হতে হয়। তবে সে চ্যালেঞ্জ যেন অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ না হয়। মুহূর্তের উন্মাদনায় কোন কাজ করা ভালো না। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে কোন কাজ করার ফলাফল অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক। চিন্তাহীন কাজের জন্য অনেক মানুষ আছেন রাতারাতি সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেন। আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে কোন কাজ করার পূর্বে তার সম্ভাব্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলো বিবেচনা করা উচিত। এতে করে আবেগের তীব্রতা অনেকাংশে কমে যায়। মানসিক শক্তিকে সৃজনাত্মক কাজে ব্যয় করা যাবে তখন। যখন আমরা বুঝতে পারব যে কাজে মূল্যের তুলনায় লাভ নেই অযথা ঝুঁকির পরিমাণ বেশী তখন বিকল্প পথ দেখাই উত্তম। জীবন চলার পথে কিছু সুর্নিদিষ্ট নিয়ম কানুন। কিছু পরিবর্তন। জীবনকে অধিকতর সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলে। নিজেকে পরিবর্তন করতে চাইলে সেই পরিবর্তনের অনেকগুলো পথও খোলা থাকে— সেই পথগুলো অবলম্বন করলে নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়। কারণ জীবন বৈশিষ্ট্যের ধারক মানুষের মন। মন স্থিতিধর্মী নয়। অন্তর-বাহির, উভয়ের আঘাতেই তা পরিবর্তন মুখী হতে পারে। তখন সে তার জীবন বৈশিষ্ট্যকে যাচাই করে নিতে চায়।

সততা, সত্যবাদিতা, ভালোবাসা

চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সততাই মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা আনয়ন করে। সততা মানুষের এক মহামূল্যবান সম্পদ। মানুষ তার জীবনের চাওয়া পাওয়ার অসামঞ্জস্যতা থেকেই অনেক অন্যায়ের আশ্রয় নেয়। প্রতিদিন আমরা অনুভব করি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং সৎ হওয়া কত প্রয়োজন।

মানুষ সাধারণত অতি শৈশবে মিথ্যা কথা বলে থাকে। ঐ সময় শিশু মনের গোপন কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করে না। ঐ সময়টিতে কল্পনা ও মিথ্যার মধ্যে কি পার্থক্য তা বুঝে উঠতে পারে না। বড় হতে হতে কল্পনা ও মিথ্যা এক থাকে না। বড় হয়ে যে মনগড়া কথা সে বলবে তাই মিথ্যাচার।

অনর্থক ঝামেলা ঠেকানোর জন্য। কিংবা লোকের কাছে ভালো সাজার জন্য মানুষ মিথ্যা কথা বলে। যে কথা বললে মানুষ খুশী হবে সেটুকু বলে মানুষ আনন্দ লাভ করে। মানুষের কাছে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে কিংবা মানুষকে মুগ্ধ করার জন্য অনেকে অহরহ মিথ্যা বলেই যান। এই অবিরত মিথ্যাচার মানুষকে প্রতারক হিসাবে গড়ে তোলে। এভাবে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করতে করতে মানুষের বিবেকের দংশনও নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীতে সত্যর সাক্ষাৎ অতি কঠিন। প্রতিটি মানুষ যাকে সত্য বলে মনে করে থাকেন। অপর ব্যক্তিও তাকে সত্য বলে মেনে চলুন। এটুকু সবাই চান। সত্য আমাদের কাছে বিভিন্ন ভাবে ধরা দেয়। এ সত্য হতে পারে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক কিংবা মনোবিজ্ঞানসম্মত। বাস্তব কোন সত্য অর্থাৎ যে যেমন মতে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের ভিত্তি প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব। অর্থাৎ আমার কাছে যা সত্য বলে গ্রহণীয়। অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। অপরের বিশ্বাসের কিছু অংশ হয়তো আমরা মানতে পারি। বস্তুত আমরা একেক জন একেক মতে বিশ্বাসী। তারপরেও বর্তমানে আমরা যে মতে বিশ্বাসী ভবিষ্যতে সেই মতের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নাও থাকতে পারে।

বয়সের সাথে সাথে মানুষের অভিজ্ঞতারও পরিবর্তন হয়। পরবর্তী জীবনে মানুষ তার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বহু জ্ঞান লাভ করে। ধীরে ধীরে মানুষের বিশ্বাস পরিবর্তন হতে থাকে। আজ যা সত্যি মনে হয় কালকেই তা

অসত্য বলে গণ্য হয়। মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট করা উচিত নয়। চারিত্রিক দৃঢ়তা মূল্যবোধকে ধারণ করে।

আমরা লোকসমাজে যে ধরনের পরিচয় দিয়ে থাকি সেরকম আচরণ করা উচিত। মুখের কথার সঙ্গে ব্যবহারের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ কেউ আশা করেন না। কথায় এক আর কার্যত ভিন্ন আচরণ আমাদের বিশ্বস্ততা নষ্ট করে দেয়। মুখোশধারী লোকের পরিণাম ভালো নয়। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চারিত্রিক দৃঢ়তাই সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়।

পৃথিবীতে আমরা পারস্পরিক নির্ভরশীল। সুতরাং এই নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে বিশ্বাস নষ্ট করা ঠিক নয়। বিশ্বাস একবার নষ্ট হলে কারো উপর ভরসা করা যায় না। সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে দ্বন্দ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে অবিশ্বাসী লোকের প্রতি মানুষের ব্যবহারে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। আমরা সাধারণত অপরকে যে সকল কাজ করতে বলি নিজে তা করি না।

সব সময় মনে রাখা উচিত আমরা লোকের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতটা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারছি। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে অন্যরাও আমাদেরকে অনুকরণ করবে। কারণ ভালো হবার ইচ্ছা সব মানুষের মাঝেই বিদ্যমান।

আমরা সব সময় চাই মানুষ কথা দিয়ে কথা রাখুক। কিন্তু আমরা নিজেরাই কতটুকু কথা দিয়ে কথা রাখছি। সেটুকু কেউ বিবেচনা করি না।

আমরা ঠিক যেমনটি, মানুষ আমাদের কাছে ততটাই প্রত্যাশা করে থাকে। এর বেশীও নয়, কমও নয়। প্রত্যক্ষভাবে আমরা হয়তো মুখে বারণ করে থাকি। পরোক্ষভাবে সেই কাজকেই উৎসাহিত করে থাকি। নিজেকে কখনও আমরা বিচারকের ভূমিকায় দাঁড় করাই না।

নিজের বিশ্বাস এবং বাক্যের সাথে অমিলই আমাদেরকে অপরের নিকট অবিশ্বাসী কর তোলে।

অন্যায় করে মন থেকে মুছে ফেললেই তো আর সব কিছু মুছে ফেলা যায় না। লোকের বিশ্বাসযোগ্যতা তখনই অর্জন সম্ভব যখন অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখের কথার মিল পাওয়া যায়। ক্ষণে ক্ষণে মত পরিবর্তন এবং আচরণের অসঙ্গতি বিশ্বস্ততা নষ্ট করে। তাই আচরণের সাথে কথা ও মূল্যবোধের সামঞ্জস্য বিশ্বাস গড়ে তোলে। প্রতিটি মানুষের মাঝেই ভুল আছে। ভুল থেকেই তো মানুষ তার গতিপথের পরিবর্তন আনে। তাই সততাই সবচাইতে উত্তম পথ।

সত্য এক তিক্ত বটিকা

পৃথিবীতে সত্য কি তা জানা অতি কঠিন। এক পথ ছেড়ে অন্য পথে নিরন্তর সত্যকে খুঁজে চলেছে মানুষ। মানুষের মনে চিরকালই সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন চলছে। সত্য একেক জনের নিকট একেক রকম। আমার নিকট যা সত্য অপরজনের নিকট তা সত্য নাও হতে পারে। আমি যা সত্য বলে মানি অপরেও তা মেনে চলুক এটুকু আমরা সবাই চাই। মূলত বিশ্বাসটাই এক ধরনের সত্য। আমরা যা বিশ্বাস করি তাই আমাদের নিকট সত্য বলে গ্রহণীয়।

তবে সত্যের রূপ যে সব সময় আমাদের নিকট একই থাকবে তা ঠিক নয়। অর্থাৎ মানুষের বিশ্বাস পরিবর্তিত হলে তার সত্যেরও পরিবর্তন ঘটে। এক সময় যা সত্য বলে মনে হয়। সময়ের ব্যবধানে অনেক ক্ষেত্রে তাকেই মিথ্যা মনে হয়। এক সময় যে কাজকে সমর্থন করা যায় কিছু সময়ের ব্যবধানে তাকেই অসমর্থন করে থাকি। ব্যক্তি বিশেষে যে সত্যকে আমরা উপলব্ধি করে থাকি তাকেই চূড়ান্ত ভেবে থাকি। অথচ সত্যে পৌছাতে গেলে কোন ব্যক্তি বিশেষের মত চূড়ান্ত নয় এটুকু আমরা বুঝতে চাই না। মানুষ যখন নিজেকে চিনতে শেখে তখন সে অপরের মতামতের প্রতি সহনশীল হতে পারে। তবে সর্বক্ষেত্রে সহনশীল হওয়াও ঠিক নয়। অতি সহনশীলতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মানুষ দূর্বিপাকে পড়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার অসহনীয়তাও আমাদের ব্যক্তি জীবনে উপকার ঘটিয়ে থাকে। তবে সহনশীলতা মানুষের ব্যক্তি জীবনের উন্নয়ন ঘটায়। যে মানুষের পক্ষে আত্মবিশ্লেষণ করা সম্ভব তিনিই সহনশীল মানুষ। আত্মবিশ্লেষণের অভাবহেতু মানুষ নিজ সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকে।

এ পৃথিবীতে মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কোন মানুষই অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয়। অনেক সময় অনেক বুদ্ধিমানও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। নিজের ক্ষমতা যাচাই না করেই নিজেকে আত্মবিশ্লেষণ না করে আমরা কাজে হাত দেই। এটাই হচ্ছে আমাদের অক্ষমতা। আর এই অক্ষমতাকেই আমরা অদৃষ্ট বলে মেনে নেই।

অনেক ক্ষেত্রে বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের অদৃষ্টের জন্য দায়ী। উচ্চাকাঙ্ক্ষা

মানুষকে বড় হতে সহায়তা করে। তবে অতি প্রত্যাশা মানুষকে লোভী করে তোলে। লোভ মানুষের জীবনের শান্তি কেড়ে নেয়। লোভী মানুষ মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটায়। এজন্য অতি আবেগের বশে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়। সাধ্যের মাঝে যেটুকু আমরা পেতে পারি ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সাধ এবং সাধ্যের মাঝে যেখানে অসামঞ্জস্য সেখানে হৃদয়ের শান্তি বিঘ্নিত হয়ে পড়ে।

মানুষ আমাদের কাছে যতটুকু প্রত্যাশা করে ততটুকুই হওয়া উচিত। আমরা ছলনা ও প্রতারণার সংসারে বাস করি। এই মিথ্যা ও প্রতারণার উৎপত্তি ভয় থেকেই হয়। কোন প্রকার নৈতিক উপদেশ বা চেষ্টা মানুষকে সাময়িকভাবে মিথ্যাচার থেকে দূরে রাখে। কিন্তু মানুষ যখন নিঃশঙ্কভাবে বেড়ে উঠতে পারে তখনই সে মিথ্যা ও কপটতা থেকে দূরে থাকে। প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ যখন মিথ্যা বলার প্রয়োজন অনুভব করে না তখনই সে মিথ্যা থেকে দূরে থাকে।

কখনও কখনও মানুষ জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলে। আবার কখনও বা মনকে প্রবঞ্চনা দিতে গিয়ে অবচেতন মনে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। যারা যেনেশুনে মিথ্যা বলেন তারা মিথ্যাবাদী। আর যারা মিথ্যা চিন্তা করেন তারা ভণ্ড। তাই যারা চিন্তা চেতনায় সত্যবাদী তারাই মূল সত্যবাদী। কারণ যারা চিন্তায় সত্যবাদী তারা মিথ্যা বলা যে সর্বক্ষেত্রে অন্যায় তা মনে করেন না। যখন মানুষ বুঝে থাকে যে সত্য বলায় বিপদ আছে তখনই সে মিথ্যা কথা বলে থাকে। অপরের ভালোর জন্য কল্পনার আশ্রয় নিয়ে মিথ্যা বলার মাঝে নেই কোন ক্ষতি। বাস্তবতার কষ্টি পাথরে এ মিথ্যা ভাষণ হলেও এতে করে মানুষ প্রবঞ্চনার শিকার হয় না। কিন্তু যে মিথ্যা দ্বারা মানুষকে প্রবঞ্চনা করা হয় তাই তো প্রকৃত মিথ্যাচার। শাস্তির মাধ্যমে মিথ্যাচার বন্ধ করার চাইতে মিথ্যা বলার যাতে প্রয়োজন না পড়ে সে ব্যবস্থা করা উচিত। কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা নিজেদেরকে অতিশক্তি সম্পন্ন, কাম, ক্রোধ ও রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত মনে করেন। অন্যের কাছে নিজেকে জাহির করার জন্য সর্বদা উপদেশবাণী প্রয়োগ করেন। অপরকে শোধরাবার জন্যই তারা এরূপ করে থাকেন। কোন মানুষই দোষত্রুটি সম্পন্ন অতিমানব নয়। ভাওতা ও ভন্ডামী দিয়ে কাউকে শুদ্ধ করতে চাইলে মানুষের মনে অবিশ্বাসী ভাবের জন্ম নেয়। তাই প্রথমেই ভাবা উচিত মানুষ কেন অন্যায় করে ও মিথ্যা বলে তার কারণ অনুসন্ধান করা এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজন মেটানো। মিথ্যা ও কপটচারীতার মাধ্যমে মানুষের সত্যবাদিতা ব্যহত হয়। সত্যবাদিতায় মানুষ নির্ভীক হয়। সৎ, সরল এবং আত্মসম্মানবোধ বাড়ে। চিন্তায় ও বাক্যে মানুষ যখন সত্যবাদী হয় তখন কোন মহত্তর উদ্দেশ্য ব্যতিত মানুষ মিথ্যা বলে না।

তাই প্রতিটি মানুষেরই উচিত চিন্তায় ও বাক্যে সত্যবাদী হওয়া, সত্যকে পরিত্যাগ করা ধন মাল অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান সম্পদ বিসর্জন দেয়ারই

রবিঠাকুরের কবিতায়—

'মনে রে আজ কহ যে,
ভালোমন্দ যাহাই আসুক
সত্যরে লও সহজে।
কেউবা তোমায় ভালোবাসে
কেউবা বাসতে পারে না যে
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে,
কতকটা সে স্বভাব তাদের
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক—
সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি
তোমার ভোগে কতক পড়বে,
পরের ভোগে থাকবে বাকি,
মান্ধাতারই আমল থেকে
চলে আসছে এমনি রকম—
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম!
মনেরে আজ কহ যে
ভালোমন্দ যাহাই আসুক
সত্যরে লও সহজে।'

চেতনার রঙে পান্না হয় সবুজ চুনি হয় রাঙা

মানুষ তার অপরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা দ্বারা নিজের সবচাইতে বেশী ক্ষতি করে থাকে। সুখের চিন্তা, খুশীর চিন্তা, ভালোলাগার চিন্তা মনের মাঝে অনুভূতির রেশ ছড়িয়ে দেয়। তেমনি রাগ, হতাশা মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলে। যে কোন চরমপন্থী চিন্তা ধ্বংস ডেকে আনে। মাঝামাঝি চিন্তাধারাটাই সবচাইতে উত্তম পন্থা, অর্থাৎ "খুব বেশী ভালো" কিংবা "খুব বেশী খারাপ" এ দুটো চিন্তাই চরমপন্থী। এ পৃথিবীতে কোন মানুষই খুব বেশী ভালো কিংবা খুব বেশী খারাপ হতে পারে না। যে চিন্তা আমাদের মনের পরিপন্থি তাকেই আমরা খারাপ বলে থাকি। যে চিন্তা মনের সাথে মিলে যায় তাকেই ভালো বলে থাকি। অনেক সময় খুব সাধারণ ঘটনাকেও অনেকে ব্যক্তিগত আক্রমণ মনে করে থাকেন। এমন অনেকে আছেন অপরের সম্পর্কে কোনরূপ সত্য মিথ্যা যাচাই না করেই অন্যের মনের কথা বলে দিতে চেষ্টা করেন। অন্যের মনের অনুভূতি বোঝা খুবই কঠিন ব্যাপার। মানুষ নিজের মনে যা অনুভব করে অন্যকে তাই ভাবার চেষ্টা করে। আর যদি নিজের মনের অবস্থা খুব খারাপ থাকে— সেই অবস্থায় একজনকে বোঝার চেষ্টা করলে তা হবে খুবই বিপদজনক।

অনেক সময় ভিত্তিহীন মূল্যবোধ আমাদের মাঝে অপরাধ বোধের সৃষ্টি করে থাকে। যার কারণে আমাদের মন হয়ে পড়ে অশান্ত। যার জন্য আমাদের অনেক চাওয়া ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

এইরকম ভিত্তিহীন মনোবাঞ্ছনার কারণে আমরা মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে হেয় চোখে দেখে থাকি।

মানুষ যখন অপরিণত বয়সের থাকে কিংবা অপরিণত মন মানসিকতার। তখন সে ভাবে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ তার সম্পর্কে ভাবছে। তাই দেখা যায় টিন এজার ছেলেমেয়েরা নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে। জীবন সম্পর্কে তাদের প্রচুর কৌতূহল। মাঝ বয়সী লোকজন নিজেকে নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত থাকেন যে, তাদের নিয়ে কে কি ভাবছে এটা নিয়ে তারা মাথা ঘামান না। বৃদ্ধ বয়সে এসে মানুষ এ জাগতিক সত্যটুকু উপলব্ধি করেন যে, পৃথিবীতে কেউ তাদের নিয়ে ভাবেন না। সবাই নিজ নিজ সমস্যা নিয়েই ভাবে।

তাই জীবনের যে কোন কাজে নামার পূর্বে সব সময় নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। সবচাইতে উত্তম পথটি আমাদের নিজেকেই বেছে নিতে হবে। এজন্য প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন নিজেকে চেনা নিজেকে চিনতে গেলে প্রথমেই নিজের শক্তি, দুর্বলতা ইত্যাদি যাচাই করে নিতে হবে। আমাদের জীবনের সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। দুর্বলতাকে পরিহার করতে হবে।

ধন্য এ মোর ধরণী

ব্যক্তিগত জীবনে নিজের কাছে সদয় হওয়া উচিত। মানুষ হিসাবে মানবীয় দোষ ত্রুটিতো সকলেরই রয়েছে। ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা নেয়া প্রতিটি মানুষেরই উচিত। নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শেখা উচিত। আমরা নিজেরাই যদি নিজেদেরকে শ্রদ্ধা করতে না পারি। তবে অপরেও আমাদের শ্রদ্ধা করতে পারবে না।

আত্মশ্রদ্ধা মানে নিজের কাছে নিজে খাঁটি থাকা। অর্থাৎ যে কোন কাজে অন্তরের সায় থাকা।

অন্তরের সায় থেকে যে উৎসাহ উদ্দীপনা আসে তা আমাদেরকে কষ্টসাধ্য পথে এগিয়ে নিতে পারে। কিসে আমাদের উৎসাহ প্রেরণা তা যদি আমরা বুঝতে পারি তবে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া এমন কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার?

আমরা যা চাই তা পাবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারি। অর্থাৎ আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রেরণার উৎস। আর এজন্য যে কোন প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য সদা তৎপর থাকা চাই। ভাগ্যে কখন কি পাব না পাব তার জন্য হাত পেতে বসে না থেকে চাওয়ার মতো চাওয়াটাই উত্তম। সব সময় সব কাজ যে আমাদের ভালো লাগবে তা নাও হতে পারে। তাই সর্বক্ষেত্রে ভালো না লাগলেও পরিকল্পনামাফিক কাজ করাই ভালো।

আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি? আমরা কোন পথে এগিয়ে চলেছি? আমাদের অতীত কেমন ছিল? কিংবা ভবিষ্যতে কি হতে পারে? তা নিয়ে আমাদের সকলেরই ভাবা উচিত। কোন দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা যদি এটুকু ভাবতে পারি। তবেই জীবনের রেখাচিত্র অঙ্কন করা কি খুব একটা কঠিন ব্যাপার? নিজের সম্পর্কে খারাপ ধারণা থেকে অপরাধবোধ জন্ম নেয়। কখনও নিজেকে খারাপ ভাবা ঠিক নয়। ভুল পথে চালিত হওয়ার জন্য অনুতাপ হওয়া সুস্থ বলিষ্ঠ মানসিকতার লক্ষণ। অর্থাৎ মানুষ ভুল করে ভুল পথে চালিত হতেই পারে। এতে মানুষটি খারাপ হয়ে যায় না। অনুতাপ একজন মানুষকে আত্মশুদ্ধি দান করে। কিন্তু অপরাধবোধ মানুষের আত্মগ্লানি বাড়ায়। মানুষকে ছোট করে। প্রতিটি মানুষেরই উচিত নিজের মাঝে বোঝা পড়া করা। কারণ

মানসিক চিন্তার নৈতিকতার কোন মূল্য নেই। আমরা যা কিছুই চিন্তা করি না কেন কার্যে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সেটার কোনই মূল্য নেই।

কোন কাজের জন্য নিজেকে অপরাধী না ভেবে কি করলে সে কাজের প্রতিকার করা যা তাই ভাবা উচিত। অপরাধবোধ থেকে মানুষ নিজেকে ছোট ভাবতে শেখে। কোন মানুষই নিষ্কলুষ, সর্বজ্ঞ এবং শক্তিমান নয়। এ পৃথিবীতে নিন্দুক ছাড়া কোন মানুষই নিখুঁত নন। সুতরাং নিজের ভালো করার চেষ্টা সবারই করা উচিত। করতে না পারলে অপরাধবোধে ভোগা ঠিক নয়। নিজ ক্ষমতার বাইরে কিছু করা ঠিক নয়।

নিজের শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে কিছু করতে যাওয়া মানে নিজের কর্মদক্ষতা হ্রাস পাওয়া। তবে কমদক্ষতা সবার এক নয়। কারো এটি সহজাত। আবার কারো জন্য এটি কষ্টার্জিত। তাই শক্তি ও সামর্থ্যের যদি উপযুক্ত ব্যবহার আমরা না করতে পারি তবে এক সময় তা শেষ হবেই। তাই প্রয়োজনীয় কাজের পেছনেই আমাদের শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা উচিত।

মানুষ যখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে তখন অন্যকে দোষ দেয়া থেকে বিরত থাকে। সেই সাথে নিজেকেও দোষারোপ করে না। মানুষ যখন ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিতে সক্ষম। সেই সাথে নিজেকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তখন মানুষ অপরের হাতের ক্রীড়নক হতে পারে না। নচেৎ মানুষ অসহায় ক্রীড়নক হয়ে পড়ে।

ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ তখনই হয় যখন একজন মানুষ কাজের পূর্ণদায়িত্ব নিতে সক্ষম। মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। তাই কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর নিখুঁত কাজ আশা করা বোকামী। কাজে ভুল ত্রুটি হওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যদি ভুল ভ্রান্তি হয়েই থাকে তবে অযথা হা হুতাশ না করে ভুল থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। সমস্যার সৃষ্টি হলে সমাধানের পথও খুঁজে বের করা যায়। দায়িত্বপূর্ণ কাজে যন্ত্রণাও রয়েছে। সেই সাথে সাহসেরও প্রয়োজন। কিন্তু এতকিছুর পরও দায়িত্ববান মানুষের আছে স্বাধীনতা ও মুক্তি। আজ যিনি পরিস্থিতি শিকার, কালই হয়তো তিনি পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ কর্তা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে অপরকে দোষারোপ না করে যথাসম্ভব নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা চাই। আমরা যা চাই তার জন্য সর্বদা ভাগ্যের উপর নির্ভর না করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। অতীতের থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের যাত্রাপথে বর্তমানকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করে নিজের উন্নতির চেষ্টা করা উচিত।

অপরকে কখনও এমন সুযোগ দেয়া উচিত নয় যাতে করে আমাদের উপর অন্যের প্রত্যাশা বেশী হয়। কখনও কখনও আমরা অপরের দ্বারা শোষিত হতে

পারি।

তাই সব ক্ষেত্রে অতি প্রশ্রয় ভালো নয়। আমরা নিজেদেরকে যতটুকু সম্মান করতে শেখাই মানুষ আমাদেরকে ঠিক ততটুকুই সম্মান করে।

এ ধরণীতে আমরা ততটুকুই সুখী হতে পারি যতটুকু আমরা অর্জন করতে পারি। সুতরাং কার কি ভুল তা নিয়ে না ভেবে নিজেকে কিভাবে শোধরাতে পারি সেটুকুই আমাদের বিবেচনার বিষয়।

স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন

অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।

এ জগতে স্বপ্ন সবাই দেখে তবে সমানভাবে নয়। রাত্রিতে যারা স্বপ্ন দেখে দিনে যখন জাগে তখন সেই স্বপ্ন হয় অসার অর্থহীন। কিন্তু দিনে যারা স্বপ্ন দেখে তারা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দান করার জন্য কাজ করতে পারে। কিন্তু এই দিবাস্বপ্ন ক'জনার পক্ষেই সার্থক রূপদান করা সম্ভব? এ সংসারে অসম্ভব সম্ভব হয়। স্বপ্ন সত্য হয়। অসহায় ভাগ্যাহত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বপ্ন বড় আকাঙ্ক্ষিত নাম। অসম্ভব স্বপ্নের কথামালায় রচিত হয় সংগীত। মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় স্বপ্ন কখনো কখনো বুদ্ধি ও আবেগজাত সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেয়। লেখক ও শিল্পীদের ধ্যান ধারণার জন্য স্বপ্নের প্রয়োজন। স্বপ্নলব্ধ ওষুধে প্রতিকার পাওয়ার নানান কিংবদন্তী আমরা শুনে থাকি। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও জাতীর মধ্যে যে ঐক্য ভিন্ন জাতির মধ্যে যে প্রেম তা স্বপ্নেই ঘটে। স্বপ্ন তো স্বপ্নই রয়ে যায়। আমাদের অনেক স্বপ্ন পূরণের জন্য নয়। শুধুমাত্র দেখার জন্যই স্বপ্ন। সুখী মানুষ আবেগের তাড়নায় সহানুভূতিশীল হয়। বিশেষ করে তার যদি না থাকে পূর্বের কোন করুণ অভিজ্ঞতা। তাতে যদি দর্শনের বীজ বোনা যায়। তবে তা বেড়ে ওঠে নতুন কল্পনার উচ্ছ্বাসে। পৃথিবীর সব যাত্রাকেই মনে হয় সুগম। যতই তা কণ্টকাকীর্ণ হোক না কেন।

দীনেন্দ্রনাথ রায়ের গল্পের সেই মেয়েটি স্বপ্ন দেখতো সমুদ্র অবগাহনের। যখন তার চোখের জল জিভে এসে ঠেকল তখন সে সমুদ্রের লোনা জলের স্বাদ খুঁজে পেল। স্বপ্নে মানুষ তার প্রিয়জনের দেখা পায়। স্বপ্ন দেখলেই হয় না, স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য যাদুর কাঠির ছোঁয়া চাই। কিন্তু বাস্তবে এ জাদুর কাঠি কি আমার জানা নেই। সময় আর পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বপ্নও পাল্টে যায়। স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃস্বপ্ন দেখারও শেষ নেই। মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসাকে সফল করে শুভতার দিকে অগ্রসর হবার ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান

আলো মনীষার হাত ধরে মানুষের পক্ষে সমাজকে তার উচ্চিমতলে [illegible] ইচ্ছা। যা মানুষের অজানা লৌকিক পৃথিবীকে ভিন্ন পথ ধরতে সাহায্য করতে পারে। সমগ্র জীবনের কোন প্রয়োজনকে খাটো করে না বরং মানুষের পক্ষে সমাজকে ধরার প্রয়োজন পড়ে। এই তাই জীবনে মনুষ্য চেতনার কাছে নিবেদন করে মানবিক প্রশ্ন উত্থাপন করে মুক্তির স্বাদ ফিরিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখি আমরা। এই স্বপ্নকে আমি হারাতে চাই না কোনভাবেই। সমগ্র মনুষ্য চেতনার মুক্তিকে আমার জীবনের সঙ্গে জড়াতে গেছে বলা হয়েছি। বলা হয়েছে আমার চেতনা। আমার অস্তিত্বের নিবিড়তম বোধ। আমার প্রতি মুহূর্তের গভীরতম অনুভূতি। আমি আমার স্বপ্নকে অঙ্কুর করে আরো বিকশিত হতে চাই। অতীতকালকে ছাড়িয়ে নিতে চাই প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌরভে সৌন্দর্যে।

কিন্তু আমরা সচেতন ভাবে বাঁচতে পারি না। অসচেতনভাবে আমরা বেঁচে থাকি। স্রোতের শ্যাওলার মতো এমনই ভেসে যাই এক সমস্যা থেকে আরেক সমস্যায়। এক পরিস্থিতি থেকে আরেক পরিস্থিতিতে। কখনও নিজেকে প্রশ্ন করি না কেন আমরা এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার। কোনটি আমাদের জীবনে সত্যিই প্রয়োজন তা আমরা ভেবে দেখি না। এভাবে জীবন চলার পথে চলতে চলতে মানুষ হারায় তার পথের দিশা। জীবনে ঘটে ছন্দপতন। জীবন হারায় তার মাধুর্য। তাই অতীতের কথা ভেবে মনকে ভারাক্রান্ত করলে চলবে না। অতীতের কথা ভাবলে তো আর অতীতকে ফেরানো সম্ভব না। আমাদের হাতে আছে বর্তমান ও ভবিষ্যত। এই বর্তমান ও ভবিষ্যতকে আমরা মনের মতো করে গড়ে নিতে পারি। বর্তমান ও ভবিষ্যতে ব্যর্থ অতীতের অনুগামী হলে চলবে না। আমাদের সুন্দর স্বপ্নগুলোকে সফল করতে চাইলে সচেতন ভাবে বাঁচতে হবে। অর্থাৎ নিজের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে হবে। জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে। মানুষের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। নিজের শক্তি সামর্থ্য এবং কাজের পিছনে ব্যয় করা সকলেরই উচিত। জীবনের স্বপ্নগুলো সার্থক তখনই হবে যখন জীবনের বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হওয়া যাবে। জীবনের কেবল মুষ্টিভিক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে বাঁচতে গেলে সুন্দর স্বপ্নগুলো সার্থক হবে না

জুলফিয়া ইসলাম, (জন্ম ১৯৬৮) আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট শিশু মনস্তত্ব, নারীদের বিভিন্ন সমস্যা সর্বোপরি মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের সমস্যাবলীকে প্রাধান্য দিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজভাবে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ইতোমধ্যে তাঁর বেশ ক'টি বই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে বর্তমানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন।